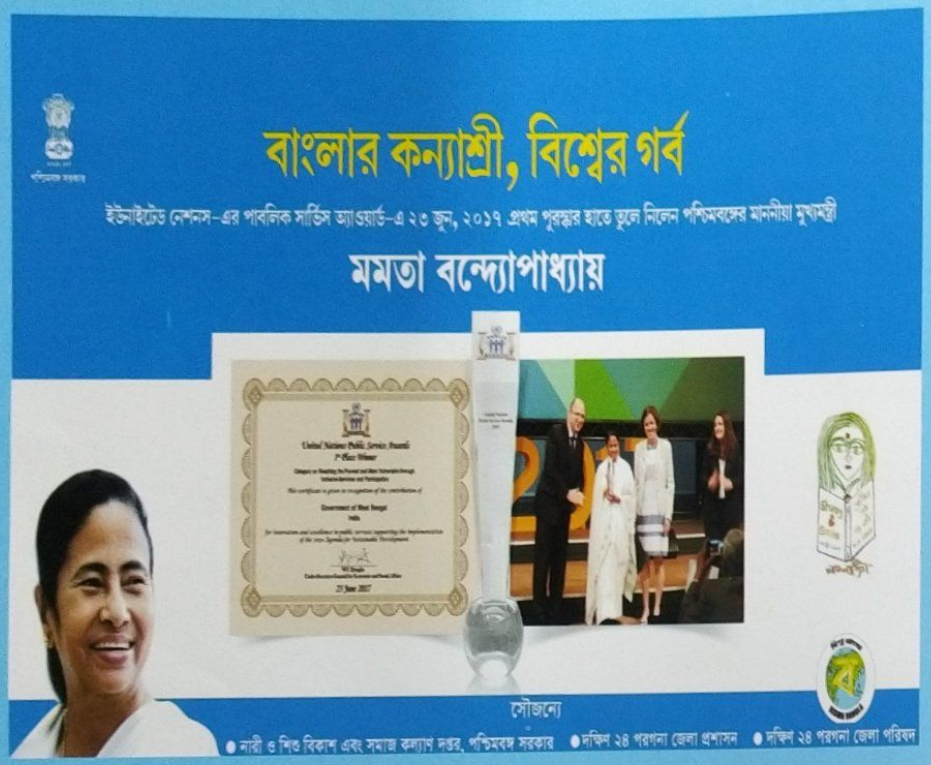

বাংলার কন্যাশ্রী, বিশ্বের গর্ব

ইউনাইটেড নেশনস-এর পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-এ ২৩ জুন, ২০১৭ প্রথম পুরস্কার হাতে তুলে নিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌজন্যে

● নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

কন্যাশ্রী উৎসব ২০১৭

ভাঙ্গড়-১ উন্নয়ন ব্লক

সহযোগিতায় ঃ

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় ছাত্র পরিষদ

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা

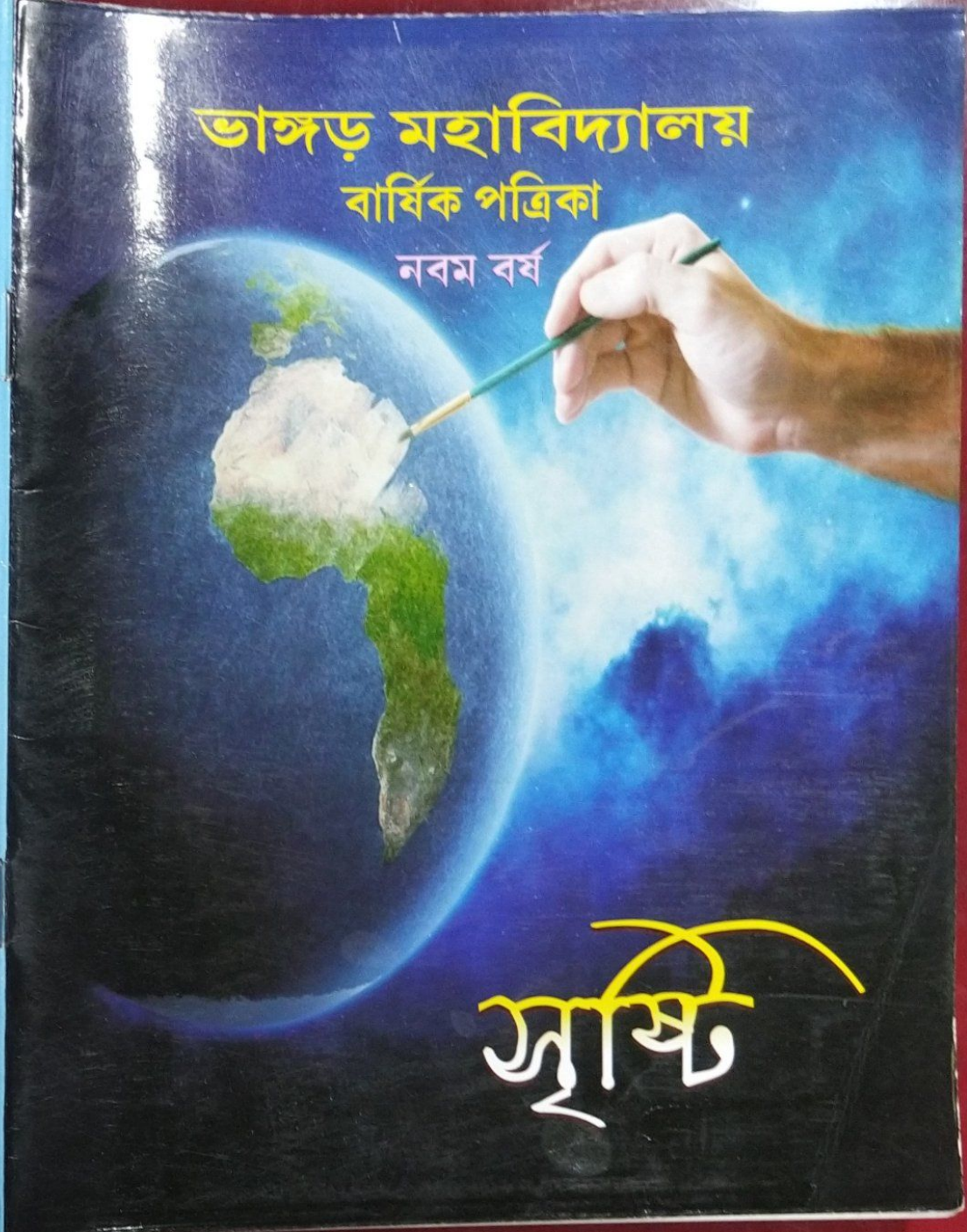

নবম বর্ষ

সৃষ্টি

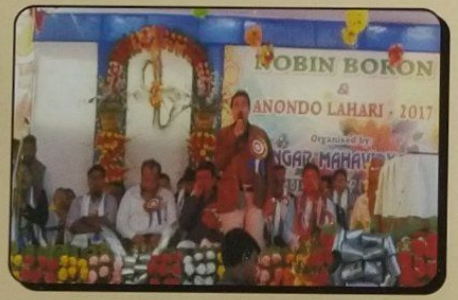

সৃষ্টি

SRISTI

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

বর্ষ - নবম

Bhangar Mahavidyalaya
Annual College Magazine

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সৃষ্টি

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

বর্ষ - নবম

SRISTI

Bhangar Mahavidyalaya
Annual College Magazine

প্রকাশ ঃ ২০১৭

সভাপতি ঃ ড. বীরবিক্রম রায়
অধ্যক্ষ, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সম্পাদক মন্ডলী ঃ যুগ্ম সম্পাদক ঃ ড. সংযুক্তা চক্রবর্ত্তী ও
শাহিদ হোসেন
সদস্য মণ্ডলী ঃ ড. নিরুপম আচার্য, মধুমিতা মজুমদার,
ড. পূর্বাশা ব্যানার্জী, শর্মিষ্ঠা সাধু, রজত দত্ত,
জগবন্ধু সরকার, সোমা রায়,লালমিয়া মোল্লা,
জাহাঙ্গীর সিরাজ, মুসা করিম,
মহঃ ওয়াসিম (ছাত্র প্রতিনিধি)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ

প্রকাশক ঃ ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

মুদ্রক ঃ রাজ প্রিন্টিং এন্ড ডি.টি.পি সেন্টার
ভাঙ্গড়, দঃ ২৪ পরগণা। ৯৭৩২৬৬২০৫৪

অভিবাদন

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের N.C.C. বিভাগের কৃতী ছাত্র তৌফিক মোল্লা আগ্রার প্যারট্রুপার ট্রেনিং স্কুল আয়োজিত ১লা নভেম্বর থেকে ২৪শে নভেম্বর ২০১৬ ব্যাপী "প্যারা বেসিক কোর্স' শিবিরে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। সমগ্র ভারতের ১৭টি DTE - র ভিতর থেকে ২০জন ছাত্র, ২০জন ছাত্রী এই শিবিরে প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন।

তৌফিক এই শিবিরে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষিত হয়ে J.U.O Rank অর্জন করেছেন। তার এই অসামান্য সাফল্যে ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় গর্বিত। আমরা তৌফিককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সূচি ঃ পৃষ্ঠা নং

সম্পাদকীয়- ৫

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন - -ড. বীরবিক্রম রায় ৬

কিছু স্মৃতি কিছু বিস্মৃতি - ড. নিরুপম আচার্য ৭

শুভেচ্ছাবার্তা - কাইজার আহমেদ ৮

হেড ক্লার্কের ডেস্ক থেকে - মহঃ কুদ্দুস আলি ৯

সাংস্কৃতিক সম্পাদক - প্রতিবেদন ১০

ক্রীড়া সম্পাদক - প্রতিবেদন ১০

প্রবন্ধ ঃ-

ঐতিহ্যানুসরণ ঃ বুদ্ধদেব বসুর রচনা থেকে ১১ - ১৬

উদ্ধাস্ত সংকট ও ইউরোপ - অধ্যাপক পূর্ণেন্দু শেখর রায় ১৭ - ১৮

বর্তমান সমাজের সংস্কৃতি ঃ অমিত কুমার মন্ডল ১৯

Essay : William Shakespeare : A Short introduction to his life and Dramatic Works
Prof- Tathagata Das ২০ - ২১

The Rise of English Novel in 18th Century - Taniya Rahaman ২২ - ২৫

গল্প ঃ

অদৃশ্য পাত্র রহস্য - অপরূপ চক্রবর্তী ২৬ - ২৯

অ্যাডভেঞ্চর - প্রদীপ কর্মকার ৩০ - ৩১

কবিতা ঃ ৩২ - ৪৪

ঐতিহ্যানুসরণ - কবিতা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশ

ড. নিরুপম আচার্য,রুমনা সরকার, লালমিঞা মোল্যা, মহিবার রহমান, জাহাঙ্গীর মোল্যা
আসরাফুল খান, মহঃ আরাবুল আলি মোল্যা, শেখ হাবিবুল্লা, আসরাফুল খান, নাসিম ইকবাল
আরাবুল ইসলাম, মিকাইল মোল্লা, ফিরোজ আলি মোল্লা, সামসুন নাহার পারভিন,
মহঃ আসিফ ইকবাল

Poem : Unemployment -Mohibar Rahaman ৪৫

Safety - Saifuddin Molla ৪৫

চিত্র ঃ- শ্রেয়া কর্মকার ৪৬

সম্পাদকীয়

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা 'সৃষ্টি' তার নবম বর্ষে পদার্পণ করল। শৈশব পার করে কৈশোরের দোরগোড়ায় পা রাখতে চলেছে 'সৃষ্টি' শৈশবের ভুল ত্রুটি কতটা কাটিয়ে উঠতে পারা গেছে তা জানিনা, তবুও সৃষ্টিকে নতুন রূপে প্রকাশ করার একটা ঐকান্তিক আন্তরিক প্রচেষ্টা রইল এই সংখ্যায়।

এই সংখ্যায় বেশ কয়েকজন অধ্যাপক অধ্যাপিকা তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়ে সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশের দুটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রন করেছি।

সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

শুভেচ্ছা বার্তা

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ পরিচালিত বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। এই প্রকাশের মুহূর্তে পত্রিকাটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও সার্থকতা কামনা করি।

ছাত্র - ছাত্রীরা মনের আনন্দে এই পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের লেখা লিখে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটাক। পঠন - পাঠনের বাইরে এই বিষয়টি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর নিয়মিত প্রকাশ সুনিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রইল।

শুভেচ্ছান্তে-
কাইজার আহমেদ
(সরকারি প্রতিনিধি)
পরিচালন সমিতি, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়।।

।। হেড ক্লার্কের ডেস্ক থেকে।।

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা 'সৃষ্টি' প্রকাশের পথে। শুভেচ্ছা রইল। ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্লাটফর্ম কে ব্যবহার করুক। নতুন নতুন সৃষ্টি কর্মে মেতে উঠুক এই আশা রাখি।

মোঃ কুদ্দুস আলি
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে

২০১৭ সালে বার্ষিক পত্রিকা সৃষ্টি প্রকাশের পথে।
এই সাধু উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।
এই প্রকাশের মুহূর্তে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

অমিত কুমার মন্ডল
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ছাত্রসংসদ

ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা 'সৃষ্টি' প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম আশা করি 'সৃষ্টি' পত্রিকা আমাদের কলেজের সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসবে নব সৃষ্টির বার্তা। এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক দেশের কোণে কোণে, সৃষ্টি হোক আরো নতুন সাহিত্য প্রতিভার। এই পত্রিকার সার্বাঙ্গীন কুশল ও বিকাশ কামনা করি।

—মহঃ নাজমুল হোসেন

শিল্পীর স্বাধীনতা

বুদ্ধদেব বসু

আমি শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এই কথাটা বলতে আজকের দিনে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়, কেননা এই বিশ্বাস যাঁরা বিসর্জন দিয়েছেন, দেশে-দেশে তাঁদের সংখ্যা বিবর্ধমান। আমি জানি, 'স্বাধীনতা' কথাটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র আপত্তি উঠবে; যে-সব যুক্তি, তর্ক, তথ্য সারে-সারে দাঁড়িয়ে যাবে তাদের সঙ্গেও পরিচয় আছে আমার। সেই যুক্তিগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, কেউ-কেউ বলবেন যে স্বাধীনতা বস্তুটা পরম নয়, আপেক্ষিক, কোনো -এক অর্থে তার অস্তিত্ব নেই ব'লেই ধরা যায়, কেননা আমরা সকলেই আমাদের শরীরের সীমায় বন্দী, আমাদের সামাজিক অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ। দ্বিতীয়ত এই যান্ত্রিক সমীকরণের যুগে, যখন মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তিকেও সেপাই - কোর্তার অবিশেষ ছাঁচে ঢালাই ক'রে দেবার চেষ্টা চলছে, যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ব্যক্তিবাদ আখ্যা দিয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবার প্রস্তাব উঠছে প্রবল হ'য়ে, তখন এমন কথা বলবার লোকেরও অভাব হবে না যে স্বাধীনতা - বাঞ্ছনীয় হওয়া দূরে থাক - রীতিমতো ক্ষতিকর, বাধাস্বরূপ; সেটা দমিত হ'লেই সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে মঙ্গল। আর তৃতীয়ত - যাঁরা এত দূর কবুল করতে রাজি হবেন না, যাঁদের মতে স্বাধীনতা কাম্য, এমনকি সম্ভবপর, তাঁরাও অনেকে বলবেন যে সেটাকে সম্ভব করার জন্যই সাময়িক ভাবে বর্জন করতে হবে; অর্থাৎ, তাকে ধ্বংস করার জন্য দিকে-দিকে যে সব শক্তি আজ উদ্ধত হ'য়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে শিল্পীকেও - তাতে তখনকার মতো তাঁর স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হ'লেও উপায় নেই।

এ-সব মত খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নয়; আমার পক্ষে সেটা অপচেষ্টা হবে। আমি সাহিত্যিক, শিল্পকলা শুধু তত্ত্ব নয় আমার কাছে, জীবনের অংশ। সাহিত্যিক হিশেবে আমি যা অনুভব করেছি, বুঝেছি, দিনে দিনে হাতে - কলমে যেটুকু শিখেছি, সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রেই দু-চার কথা বলতে চাই। শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি, সেই কথাটাকে প্রথমে স্পষ্ট করা যাক।

বলা বাহুল্য, শিল্পী ও মানুষ, এবং অন্যান্য মানুষের মতোই দেহের সীমায়, দেশ-কালের পরিবেশে আবদ্ধ। এ-কথাও সত্য যে তাঁর সমাজের জীবন থেকে, সমসাময়িক ইতিহাস থেকেই তাঁর অভিজ্ঞতার অধিকাংশ তিনি আহরণ ক'রে থাকেন। অর্থাৎ, যেখানে তিনি সকলের সঙ্গে অভিন্ন, সেখানেই তাঁর উপাদানের ভাণ্ডার। কিন্তু তাঁর হাতে প'ড়ে সেই উপাদান যা হয়ে ওঠে, শিল্পরচনায় যে- অভিজ্ঞতাটি প্রকাশিত হয়, সেটা বিশেষ, সেটা অনন্য, সেটা তাঁরই ব্যক্তিত্ব থেকে সঞ্জাত। তার মানে সেটা 'ব্যক্তিগত' নয়, 'প্রাইভেট' নয় ; -তাহ'লে কোনো প্রকাশ হ'তো না, কোনো সংক্রাম সম্ভব হ'তো না অন্যদের মনে।

এই যেগুলো সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতা, এগুলো যে হঠাৎ এক জায়গায় এসে বিশেষ হ'য়ে ওঠে যেন তুলনাহীন, এইটেই শিল্পপ্রক্রিয়ার মূল রহস্য। জীবনের অতি সাধারণ তথ্যের রূপান্তর ঘটে সেখানে; তারা অর্থ পায়, দ্যোতনা পায়, দূরস্পর্শী ইঙ্গিতে আলোকিত হ'য়ে ওঠে। আমরা যখন সাহিত্য পড়ি তখন আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের তথ্যগুলিকেই চিনতে পারি সেখানে কিন্তু ঠিক সেগুলোকেও নয়। সেই সব

তথ্য, যা বাস্তব জীবনে অস্পষ্ট, এলোমেলো, যোগ সূত্রহীন, কিংবা অভ্যাসে পরিজীর্ণ, সেগুলোকে যেখানে সুসংবদ্ধ রূপে দেখতে পাই, স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণ ক'রে উপলব্ধি করি, তাকেই আমরা বলি আর্ট, বলি শিল্পকর্ম। এমন প্রবল তার সংঘাত, এমন নিবিড় তার প্রভাব আমাদের মনের উপর, যে হাজার বার জানা কথাটাও নতুন লাগে সেখানে, মনে হয় যেন এ-রকম আর - কিছুই হয়নি, যেন এই প্রথম একটা দেখতে পেলাম, চিনতে পারলাম। অর্থাৎ, শিল্পীর যেটা নিজস্ব এবং বিশেষ দৃষ্টি, তার অংশীদার হ'য়ে তবেই আমরা সাধারণকে চিনতে পারি। এই অর্থেই শিল্পী তাঁর স্বজাতির কিংবা বিশ্ব-মানবের মুখপাত্র।

কিন্তু তথ্যের অভিজ্ঞতা আর যুগপৎ সম্ভব নয়, ঘটনাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে হ'লে ঘটনা থেকে স'রে যেতে হয়। এই মানসিক অপসরণের জন্য শিল্পীর চাই অনাসক্ত দৃষ্টি ; মানুষ হিসেবে সাধারণ সুখদুঃখ সকলের সঙ্গে সমানভাবেই তিনি ভোগ করবেন, কিন্তু তিনি যখন শিল্পী, তখন ঐ মানবভাগ্যের অন্তর্গত হ'য়েও তাঁকে দেখতে হবে যেন বাইরে থেকে, বলতে হবে এমনভাবে যেন তিনি অংশভাগী নন, দর্শক, এবং দর্শয়িতা বা সূত্রধর। ঘটনার উতরোল বিশৃঙ্খলায় বিহ্বল হ'লে তাঁর চলবে না ; অর্থ বোঝার জন্য, অনুয়সাধনের জন্য তাঁকে তখনকার মতো হ'তে হবে মনের দিক থেকে আত্মস্থ, আত্ম - সম্পূর্ণ। আর এই স'রে যাবার, স'রে দাঁড়াবার প্রয়োজন থেকেই তাঁর স্বাধীনতার উদ্ভব - শিল্পীর পক্ষে স্বঃসিদ্ধ সেই স্বরাজ ; যতক্ষণ যতটুকু তিনি শিল্পী, ততক্ষণ এবং ততটুকুই স্বতঃসিদ্ধ। তাঁর জীবনের অনেকটা অংশই আকস্মিক; যে-দেশে, যে-সময়ে তিনি জন্মান, যে সব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়, তার কিছুই বেছে নিতে পারেন না তিনি; অনেক সময় তাঁর জীবিকার উপায় বা জীবনযাপনের রীতির উপরেও তাঁর হাত থাকে না। কিন্তু এই পুঞ্জ-পুঞ্জ অভিজ্ঞতাকে কেমন ক'রে তিনি ব্যবহার করবেন, কতটুকু তর রাখবেন, কতটা ফেলে দেবেন, সেই অসংলগ্ন ভগ্নাংশরাশিকে কোন চিন্তা - সূত্রে গ্রথিত করবেন, কী-রকম আকৃতি, অবয়ব দেবেন তাকে, কী অর্থ তাঁর পাত্রটুকুতে ধরাবেন-এ-সব বিষয়ে তিনিই তাঁর উপরে কথা বলার কেউ নেই, তাঁর শিল্পের যে-সব শাসনে স্বেচ্ছায় তিনি নিজেকে বাঁধেন, তা ছাড়া আর কোনো শর্তেরই তিনি অধীন নন। মানুষ হিসেবে তাঁর অবস্থা তাঁর আজ্ঞাবহ নয়, ঘটনাচক্র তাঁর ইচ্ছা মেনে চলে না, কিন্তু শিল্পী হিসেবে তাঁর অধিকার অনাহত ; তাঁর রচনার রূপ, বিষয় বক্তব্য, এ-সব বিষয় মুক্ত ইচ্ছার প্রয়োগে কোনো বাধা নেই তাঁর, থাকতেই পারে না - যদি তাঁর জন্য সমসাময়িক সমাজের হাতে তাঁকে উপেক্ষিত বা নিপীড়িত হ'তেও হয়, তবু এখানে তার আপন প্রবৃত্তির পরামর্শই চরম। যখন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি দুর্গম বেগে ব'য়ে চলে, তখন তাকে যে-কোনো ভাবে শাসন করা শিল্পীর পক্ষে অসাধ্য হ'তে পারে ; অসংখ্য সাধারণ মানুষের মতো, তিনিও অসহায়ভাবে বন্যার মুখে ভেসে যেতে পারেন। এমনও হ'তে পারে যে অবস্থার চাপ সইতে না-পেরে হেরে গেলেন তিনি, শিল্পকর্মে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু তাতে এ-কথা প্রমাণ হ'লো না যে শিল্প যথেষ্ট শক্তিমান নয় ; তাতে বোঝা গেলো যে শিল্পীরও মানবিক দুর্বলতা আছে। কথাটা এই যে শিল্পী যতক্ষণ তাঁর নিজের বৃত্তি পালন করেন, ততক্ষণ যে-কোনো অবস্থায়, তিনিই কর্তা ; তাঁর কর্মের উপাদান এবং রূপায়ণ আদ্যন্ত তাঁর বশবর্তী। অর্থাৎ, শিল্পী হিশেবে তিনি যা-কিছু করেন সেখানে তিনি স্বভাবতই স্বাধীন ; বাইরের দিক থেকে যত কঠোর আবদ্ধতাই থাক, এর কখনো

ব্যতিক্রম হ'তে পারে না, কেননা এই স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হওয়া মানেই তাঁর শিল্পী-সত্তার অবসান।

জর্মান কবি রাইনের মারিয়া রিলকের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শিল্পী যে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, এই কথাটাই রিলকে তাঁর 'তরুণ কবিকে লেখা পত্রাবলি'তে বলেছেন, বলেছেন ঠিক সেটুকু অতিরঞ্জন ক'রে, মনের মধ্যে গেঁথে দেবার জন্য অনেক সময়ই যার প্রয়োজন হয়। 'মনে করো তুমি কারাগারে আছো, যার দেয়াল পেরিয়ে পৃথিবীর কোনো শব্দই তোমার চেতনায় পৌঁছয় না - তবু, তবুও কি নিয়ত তোমার শৈশব তোমার সম্পদ হ'য়ে নেই, সেই মূলবান, রাজকীয় ঐশ্বর্য, স্মৃতির সেই রত্নভাণ্ডার? .... আর সেই অন্তর্গামিতা, অর্ন্তমুখিতা, থেকে যদি কোনো কবিতা আসে, তাহ'লে এ-কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করার চিন্তা কোরো না সেগুলো ভালো হয়েছে কিনা।... সেই শিল্পকর্মই ভালো, যার জন্ম হয়েছে প্রয়োজন থেকে।'

এ-রকম উক্তির আক্ষরিক অর্থ ক'রে একে অসার ব'লে উড়িয়ে দেয়া সহজ। কিন্তু এই ধীর, গম্ভীর কথাগুলির মধ্যে সত্যের যে-কঠিন শাঁসটুকু আছে, তা উপলব্ধি করবেন তাঁরাই, যাঁরা জীবনের যে-কোনো সময়ে নিজের ভিতর থেকে বাইরের কিছু টেনে আনতে চেয়েছেন, চেয়েছেন অঙ্কুরিত হ'তে, সৃষ্টি করতে। যাকে রিলকে বলেছেন 'প্রয়োজন' - যা থেকে শিল্পকলার জন্ম - তার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হয় শিল্পীকে, কিছুই হাতে রাখলে চলে না। এই আত্মসমর্পণ সহজ নয়, তার জন্য নিজের মধ্যে স্তব্ধ হ'তে হয়, অতিশয় শান্ত হ'য়ে, ক্ষুদ্র হ'য়ে, প্রতীক্ষা করতে হয় তার। বলতেই হবে, তাই কথা বলেন শিল্পী ; সেটা তাঁর বাধ্যতা ; নিজের কাছে সেই দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন এমন সাধ্য তাঁর নেই। কিন্তু কী তিনি বলতে চান, কী সেই বাণী, যার বীজ জন্মের জন্য উন্মুখ হ'য়ে আছে তাঁর মধ্যে - সেইটি বুঝতেও ভুল হয় অনেক সময়, নিজেকে জানতে ভুল হয়। যা আকস্মিক, যা সময়োচিত, তা অনেক সময় উদ্‌ভ্রান্ত করে, কিংবা ঘটনার উত্থান - পতনের কলরোলে অন্তরের মৃদু গুঞ্জন ডুবে যায়। শিল্পীর প্রথম কর্তব্য তাই নিজেকে আবিষ্কার করা, আর তার জন্য নিজের মনের অনেক গভীর নামতে হয় তাঁকে, পৌঁছতে হয় মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সেই গহনে, যেখানে পাথর কাদা আবর্জনার স্তূপের ফাঁকে - ফাঁকে স্তরে - স্তরে সঞ্চিত আছে তাঁর সার্থক অভিজ্ঞতা, যেন মূল্যাবান ধাতুর আদিম রূপ, অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়ে আছে হাতের স্পর্শে হাতুড়ির আঘাতে রূপান্তরিত হবার প্রতীক্ষা নিয়ে। আর এই আত্ম - আবিষ্কার, আত্ম - প্রকাশের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়াটি যতক্ষণ চলতে থাকে - জীবন ভ'রেই চলা উচিত - ততক্ষণ বাইরের কোনো শাসন শিল্পীর উপর প্রযোজ্য নয়, এই কাজেরই যা অর্ন্তগত নয় এমন কোনো দাবি তাঁর উপর করা চলবে না ; এই দায়িত্ব একাই যথেষ্ট গুরুভার। এই ভাবে, তাঁর কর্মের বাধ্যতাই তাঁকে মুক্তি এনে দেয়, সৃষ্টিকর্মের সুকঠিন শর্ত থেকেই এর উদ্ভব। এই স্বাধীনতা বাইরে থেকে কেউ দান করছে না। তাঁকে, বাইরে থেকে কেউ কেড়ে নিতেও পারে না - যদি না তিনি স্বেচ্ছায় সেটি ত্যাগ করতে রাজি হন।

এতক্ষণ যা বলা হ'লো তা থেকে আশা করি এমন কথা কেউ ভাবলেন না যে শিল্পীকে তাঁর সাংসারিক কর্তব্য থেকেও ছুটি দিতে চাচ্ছি ; চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর স্বরাজ্য বোঝানোই আমার উদ্দেশ্য। আমি বলতে চাই যে শিল্পী স্বভাবতই ব্রাত্য ; কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া, কোনো সংঘবদ্ধ মতবাদ গ্রহণ

ক'রে সেই মতেই নৈষ্ঠিকতা বাঁচিয়ে চলা - এটা প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল নয়। অন্য সমস্ত চিন্তার ধারা বর্জন ক'রে তিনি যদি একান্তভাবে একটিমাত্র মতবাদেই দীক্ষা নেন - সে মতবাদের নিজস্ব মূল্য যা-ই হোক না - তাহ'লে তাঁর দৃষ্টি ব্যাহত হবার, ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হবার আশঙ্কা থাকে। তাহ'লে, খুব সম্ভব, তাঁর অভিজ্ঞতাগুলোকে আপন প্রেরণার সুস্থির এবং সুপক হ'তে না-দিয়ে, তিনি তাদের কেটে-ছেঁটে শাস্ত্রের মাপে মিলিয়ে নিতে চাইবেন। ফলত, তাঁর বাণীর লক্ষ্য হবে - সমগ্র মানবাত্মা নয়, নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। শিল্পীর পক্ষে এক মানে বৈকল্য, বা বিকৃতি।

আজকের দিনে পশ্চিমি জগতে দীক্ষাগ্রহণের ধুম প'ড়ে গেছে। সেখানকার অনেক লেখক, মনীষী - তাঁদের মধ্যেও কেউ - কেউ অগ্রগণ্য - তাঁরা শিল্পীর জন্মগত অধিকারে আস্থা হারিয়ে কোনো - না - কোনো অনন্য মতবাদের পতাকা নিয়েছেন কাঁধে তুলে। তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন, যে একটিমাত্র মতবাদ যদি জগৎসুদ্ধ, সবাই মেনে নেয়, তাহ'লেই মানুষের ত্রাণ হ'তে পারে। এই যেটা এতকাল ছিলো ধর্মযাজকের মনোভাব, আজ সেটা সাহিত্যেও উগ্র হ'য়ে উঠেছে ; সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একটা লক্ষণ এই যে তার অনেকটা অংশই ধর্ম - যুদ্ধের ভেরীনির্ঘোষ ; অর্থাৎ তার পরিচয় যেন নিজের মধ্যে বিধৃত হ'য়ে নেই, কোনো - কিছুর পক্ষ নিয়ে, বা অন্য কিছুর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে, তবেই তা সম্ভব হ'তে পেরেছে। দেখা যাচ্ছে আটলান্টিকের দুই তটে ভিন্ন-ভিন্ন শিবির পড়েছে লেখকদের ; কেউ - কেউ মার্ক্সবাদে প্রতিশ্রুত - কিংবা তার কোনো -না-কোনো প্রকরণে সনাতন ক্যাথলিথ ধর্মের শরণ নিয়েছেন কেউ - কেউ, আর কেউ হয়তো নতুনতর মার্কিন মন্ত্র জপাতে চাচ্ছেন জগৎটাকে। এঁরা পরস্পরের বিরোধী, কিন্তু এই বিরোধিতার মধ্যেই একটা জায়গায় সাদৃশ্য আছে এঁদের ; যারা সহযাত্রী নয় তারা যে সকলেই পতিত, আর সেই পতিতদের দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করাই চাই, এই প্রত্যয় এঁদের সকলের মনেই দুর্মর। এতে কখনো - কখনো তীব্রতা আসে রচনায়, যেন সৈনিকের সঙিনের ধার, কিন্তু সেই সঙ্গে সীমাবদ্ধতাও দেখা দেয়, একটি বই রং ধরে না ; প'ড়ে মনে হয় - অন্তত অদীক্ষিত পাঠকের মনে হয় - যে লেখকের মন একটিমাত্র সংকীর্ণ পথেই চলতে জানে, এই বিশাল বিচিত্র মানবজীবনের যে-কোনো প্রসঙ্গ, যে-কোনো সূত্রকে তাঁরমতবাদের চৌহদ্দির মধ্যে যে ক'রে হোক টেনে আনাই যেন তাঁর প্রতিজ্ঞা।

এই ভাবটা ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারায় কখনো স্থান পায়নি। ভারতীয় কবির যেটা আবহমান বৃত্তি, যেখানে তিনি মুক্ত মনেরই অভিভূ ; কোনো সাম্প্রদায়িক উপবীত তিনি ধারণ করেন না, কিছুই প্রত্যাখ্যান করেন না, আবার কোনো-কিছুই চূড়ান্ত ব'লে গ্রহণ করেন না, মনের সবগুলো দরজা-জানলা খোলা রাখেন যে-কোনো দিক থেকে আলো আসার জন্য। এর ব্যতিক্রম নেই তা বলি না, কিন্তু ভারতীয় কবি বলতে যে-ছবিটা আমাদের মনে জাগে সেটা শুদ্ধাচারী মঠবাসীর নয়, খোলা হাওয়ার ধুলোর পথে চলা পথিকের। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম এবং আরো যে-সব লৌকিক ধারা এই দেশেরই মাটিতে জন্মেছিলো, তাদের পাশাপাশি মেলামেশির পরিচয় আমাদের পুরোনো সাহিত্যে গ্রথিত হ'য়ে আছে ; আছেন, তাঁর সময়কার লক্ষণসম্পন্ন কবির, যিনি না - হিন্দু না - মুসলিম, কিংবা একাধারে দু-ই। আর আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ, এই সমন্বয়ধর্মী ভারতীয় মনেরই ভাস্বর ব্যঞ্জনা তিনি। রাষ্ট্রে, ধর্মে, সমাজে, তাঁর জীবৎকালে

যত আন্দোলন এ-দেশে জেগে উঠেছিলো, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে সাড়া দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাকে ফলিয়ে তুলেছিলেন সাহিত্যে, কখনো - কখনো প্রত্যক্ষভাবেও অংশ নিয়েছিলেন ; কিন্তু কদাচ কোনো সংঘভুক্ত হননি, কোনো পুরোহিতের আনুগত্য স্বীকার করেননি, তাঁকে বাঁধতে পারে এমন বাঁধন করো হাতেই তৈরি হ'লো না। তাই তিনি হিন্দুয়ানির নিন্দাভাজন হয়েছেন, আবার গোঁড়া ব্রাহ্মেরও মনঃপূত হ'তে পারেননি, এবং কোনো রাষ্ট্রনেতার থলির মধ্যে তাঁকে ধরানো গেলো না কোনোদিন। যে-কথাটা আজ পশ্চিমি দেশে প্রবল হ'য়ে উঠেছে, যে মানুষের সামনে একটি ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই, এটা আমাদের কানে অদ্ভুত শোনায়, এটা আমাদের ইতিহাস - চেতনার বহির্ভূত। এই অনন্যবাদ বিশেষভাবে পাশ্চাত্ত্য, এবং পাশ্চাত্ত্য জগতে নতুন কিছুও নয়, কেননা বহু যুগ ধ'রে এই ধারণা সেখানে বদ্ধমূল যে যীশু মানুষের একমাত্র ত্রাতা। কিন্তু ঐ 'একমাত্র' কথাটা ভারতীয় মন কখনো মানতে পারেনি ; 'মামেকং শরণং ব্রজ' সত্ত্বেও হিন্দুর পক্ষে কোনো বিশ্বাসই আবশ্যিক নয়, ভগবানে বিশ্বাস পর্যন্ত না - নানা নামে তিনি এক, এই হ'লো ভারতবর্ষীয় কথা ; - 'মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে জনে-জনে, এক পন্থা নহে।'

এই ঐতিহ্য, যাকে রবীন্দ্রনাথ আরো অনেক সমৃদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন, তার শক্তি ইতিমধ্যেই ক্ষ'য়ে গেছে এমন কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। তবে সম্প্রতি একে অস্বীকার করার উদ্যম চলেছে দেশের মধ্যে ; আমাদের দেশেও সংঘে যোগ দিচ্ছেন লেখকরা, সম্প্রদায়ের সংলগ্ন হচ্ছেন, আপ্তবাক্যের চশমা প'রে জগৎটার দিকে তাকিয়ে দেকছেন। এই শঙ্কিল, বিশৃঙ্খল সময়ে, যখন ক্রান্তিকালের ঝোড়ো হাওয়ায় জীবনের দড়িদড়া প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছে, তখন এই রকম কোনো মতবাদের দেয়াল-ঘেরা কেল্লার মধ্যে আশ্রয় পাওয়া যায় সে-কথা সত্য, হয়তো কোনো - এক রকমের নিশ্চিত জোটে। কিন্তু সে-নিশ্চিতি কতটুকু পুষ্টি দিতে পারবে মানুষকে, যার জন্য মূল্য দিতে হয় তার চিন্তার স্বাধীনতা, তার চিত্তের স্বতঃস্ফূর্তি? বিশেষত, জীবনের মূল্যবোধ যখন বিপর্যস্ত, তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখা, জাগিয়ে তোলাই তো শিল্পীর কর্তব্য - সেই সব বড়ো - বড়ো পুরোনো মূল্য, যা মানব - সভ্যতার সমবয়সী ব'লেই কোনোদিন পুরোনো হয় না, মানুষের সকল শুভকর্মের যা উৎপত্তিস্থল। শিল্পী যদি একান্তভাবে গোষ্ঠীগত হ'য়ে প'ড়েন, যদি তাঁর নিজেরই দৃষ্টি খণ্ডিত হয়, তাহলে জীবনের অবিকল চেতনা কেমন ক'রে আশা করবো তাঁর কাছে? যাঁকে শিল্পী বলি, তাঁর বুদ্ধি পূর্ণজাগ্রত, সংবেদনশীলতা চরম ; জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অবিরলভাবে বেড়ে ওঠেন তিনি, কোনো-একটা জায়গায় এসে আটকে যান না। তাঁর জিজ্ঞাসা সর্বত্র, তাঁর এষণা স্বাধীনভাবে ধাবিত হয় সকল ক্ষেত্রে, আপন প্রকৃতির দাবি অনুসারে চারদিক থেকে তিনি শোষণ ক'রে নেন যেটুকু তাঁর বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন। শিল্পীর মন বহুরূপী,

আমরা অবাক হই, যখন আজকের দিনেও টি.এস.এলিয়টের মতো মনীষী 'হীদেন' আখ্যা দিয়ে তাদের জন্য করুণা প্রকাশ করেন, কিংবা কোটি-কোটি 'পতিত' মানুষে অধিবাসিত বিশাল এশিয়ার দিকে তাকিয়ে পল ক্লোদেলের নৈষ্ঠিক হৃদয়ে পবিত্র রোষাগ্নি জ্ব'লে ওঠে। আমরা অবাক হই, বিব্রত বোধ করি। পক্ষান্তরে গীতার উপদেশ অনন্যবাদের ঘোষণারূপে গ্রাহ্য নয় ; 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামকং ব্রজ', এ-কথা বলাও যা আর স্বধর্ম রক্ষা ক'রে মামেকং শরণং ব্রজ এ-কথা বলাও তা-ই প্রমথ চৌধুরীর এই ব্যাখ্যায়

ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থন আছে। 'পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী দেখিয়েছেন যে ভারতীয় মধ্যযুগে ভগবদ্‌ভক্ত ও বৈষ্ণব এ-দুটি পর্যায়-শব্দ ছিল, সুতরাং ব্রাহ্মণের মতো পাঠানও স্বধর্ম রক্ষা ক'রেও পরম-বৈষ্ণব অর্থাৎ পরম-ভাগবত হ'তে পারত। ঐ স্বধর্ম রক্ষার কথাটা শিল্পীর পক্ষে পরম উপদেশ।

তার গতিবিধি অনির্ণেয়, তার ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। এই মনের উদাহরণ আছেন রবীন্দ্রনাথ, কিংবা গ্যেটে - যাঁকে বলা হয়েছে একাধারে ক্যাথলিক আর প্রটেস্টান্ট, জার্মান এবং লাটিন চরিত্রের প্রতিনিধি, একাধারে রেনেসাঁসের সন্তান এবং মার্টিন লুথারের উত্তরসাধক। এই রকম মন সব বিরোধ ভঞ্জন করে, সব বিপরীতকে মিলিয়ে নেয় নিজের মধ্যে ; সেটাই তার পূর্ণতালাভের প্রক্রিয়া। বলা বাহুল্য, এই আদর্শে পৌছনো দুরূহ, কিন্তু দুরূহ ব'লে এটা অনুসরণযোগ্য, সাধনযোগ্য। আদর্শের সঙ্গে সাধ্যের ব্যবধান থেকেই কঠিনতর প্রচেষ্টার প্রেরণা আসে, কিন্তু আদর্শ টাকেই নামিয়ে দিলে সিদ্ধির কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

(লেখকের ব্যবহৃত বানান
অবিকৃত আছে।)

উদ্বাস্তু সংকট ও ইউরোপ

পূর্ণেন্দু শেখর রায়
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

'বিশ্ব শরণার্থী দিবস' ২০শেজুন ২০১৫ পালিত হল রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে। সেখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সম্পাদক বান কি মুন-এর বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন "Refugees are people like anyone else, like you and me. They led ordinary lives before becoming displaced, and their biggest dream is to be able to live normally again. On this world refugee day. Let us recall our commom humanity, elebrate tolerance and diversity any open our hearts to refugees every where."

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি শরণার্থীদের পরিচয় কি? গোটা বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যুদ্ধজনিত কারণে, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, আর্থ-রাজনৈতিক, ও আন্তঃ রাষ্ট্রীয় বিবাদমান সম্পর্ক জনিত কারণে বহু সংখ্যক মানুষ নিজস্ব ঘরবাড়ি, জমি-জমা ছেড়ে অনিশ্চিত অজানা ঠিকানায় পাড়ি জমাচ্ছে নতুন ভবিষ্যতের সন্ধানে। কিন্তু তার পরিণতি খুবই করুণ। আমরা সবাই জানি ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে তুরস্কের সমুদ্র তীরে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল একটি শিশু। লাল জামা, নীল প্যান্ট, পায়ে খুদে খুদে জুতো। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে তার মুখ। তার নাম আয়লান কুদি।

সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে দেশ বিদেশের নানা ওয়েব সাইটে ছবিটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। আর সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে পুরানো প্রশ্নটাও - আর কতদিন যুদ্ধের বলি হবে নিরীহ জীবন? কেউ প্রাণ দেবে বোমা-গুলিতে, আবার কারও জীবন শেষে হয়ে যাবে নিজের দেশ ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে।

সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত এক শরণার্থী পরিবারের তিন বছরের সন্তান আলিয়ান। এরূপ অসংখ্য ঘটনা আমরা অনেক সময় সোশ্যাল মিডায়ায় দেখতে পাই আবার অনেক সময় অগোচরে ঘটে যায়। আসলে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত কারণে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ ইউরোপের দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। তাদের যাত্রাপথ মোটেই সুগম ছিল না। বাড়ির নতুন প্রজন্মের পুরুষ মহিলারা সম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন, সবকিছু ছেড়ে স্বামী স্ত্রী সন্তান সম্পত্তি নিয়ে রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিচ্ছে। সমুদ্র পথে ভিড়ে ঠাসা ঠাসি উত্তাল তরঙ্গের মধ্যদিয়ে। এভাবে তারা পৌছে যাচ্ছে গ্রীস, তুরস্ক হয়ে ইউরোপের মুল ভূখন্ডের দেশ সমূহে। শরণার্থী সঙ্কট ঠেকাতে ভেঙে পড়েছে ইউরোপের সীমান্ত বিধি! মন্তব্য করেন স্লোভাকিয়ার বিদেশ মন্ত্রী। জার্মানির এক নেতার দাবী, উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান না বেরোলে মানুষের চাপে ইউরোপীয় ইউনিয়নই ভেঙে পড়বে। আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া থেকে ইউরোপে আশ্রয়ের খোঁজে আসা শরণার্থীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রায় প্রতিটি দেশ। এত মানুষকে কীভাবে জায়গা দেওয়া সম্ভব - সেই প্রশ্নে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা ইউরোপ।

স্থির হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনসংখ্যা বিচার করে প্রায় ১ লক্ষ্য ৬০ হাজার শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় অভিনব প্রস্তাব দিয়েছেন মিশরের ধনকুবের নজিব সাওয়িরিসতা। তিনি গ্রিস কিংম্বা ইতালির একটি করে দ্বীপ কিনতে চেয়েছেন।

এটা ঠিক যে সিরিয়া থেকে আসা মানুষদের দেশে ফেরানো সম্ভব নয় বলে জানালেও সংকট মোকাবিলায় ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা একমত হতে পারেন নি। ইউরোপিয়ান ডেইলি ২০ আগষ্ট ২০১৫ এক রিপোর্টে জানায় যে, শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় জার্মানি প্রায় ৮ লাখ শরণার্থীর আশ্রয় দেবে বলে জানায়। যা তাদের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ। এই শরণার্থীরা মূলত সিরিয়া, ইরাক এবং আফগানিস্তান থেকে আগত এবং ইউরোপ সন্নিকটস্থ এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে প্রায় যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশ ও চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে গ্রীস ও ইতালি হয়ে ইউরোপীয় ভূখন্ডে প্রবেশ করছে।

'The Time' পত্রিকায় মানবাধিকার কর্মী Anjelina Joli সম্পাদকীয়তে লেখেন যে প্রবল যুদ্ধ জনিত কারণে ও চরম দারিদ্র্য জনিত কারণে দুই ধরনের শরণার্থীদের আগমন ঘটেছে। যুদ্ধজনিত কারণে যারা এসেছেন তাদের সমস্ত ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়ণ ও বিপদের থেকে মুক্তি ও সরক্ষা পেতে পাশে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন "We should be conscious of the distinction between economic migrants, who are trying to escape extreme poverty, and refugees who are fleeing an immediate threat to their lives."

পিটার সাউদারল্যান্ড সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের 'Migration and Development' এর সেক্রেটারি জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি দাবী করেন EU সমস্ত দেশগুলির মধ্যে "harmonised system" এবং 'fair allocation' চালু করতে হবে। UNHCR এর প্রধান Antionio Guteres শরণার্থীদের জন্য আইনী সহযোগিতার কথা তুলে ধরেন এবং বলেন যে শরণার্থী পরিবারের ভিসার সংখ্যা বাড়িয়ে খুবই সহজে ইউরোপে প্রবেশ করতে পারে ও বিনা বাধায় ইউরোপে জীবন যাপন করতে পারে তার কথা তুলে ধরেন।

বর্তমান সমাজের সংস্কৃতি

অমিত কুমার মন্ডল
প্রথম বর্ষ (সাধারণ বিভাগ)

আমরা আজ বিচ্ছিন্ন, কারণ আমাদের মধ্যে সংস্কৃতি হারিয়ে গিয়েছে। অপসংস্কৃতি আমাদের শহরে গ্রামে মহল্লায় ভরে গিয়েছে। এই বাস্তব সময়ে কেউ কাউকে সম্মান জানায় না। পুরানো দিনের সেই কথা কোনো বয়স্কদের মুখে শুনলে সংস্কৃতি বোঝা যায়। বর্তমান সমাজে কোথায় এসে পৌঁচেছে। এই দোষ কোনো অবহওয়া জলবায়ুর, হয়তো কেউ ভাবতে পারে, কোনো জন্তু জানোয়ারের না সমস্ত দোষ টাই মানুষের। আমাদের মাতৃভূমির সংস্কৃতিটিকে স্বাধুবাদ জানাচ্ছি। বাংলার সংস্কৃতিটি যদি আমরা সবাই মিলে পালন করতাম, আজকের বর্তমান সমাজে এত তীব্র জাতি ভেদাভেদ থাকত না, হিংসা থাকত না। এই বিজ্ঞানের যুগে , আমাদের দেশ উন্নত রাস্তা ঘাট উন্নত ঘরে ঘরে বিজ্ঞানের সাফল্য পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আমাদের ঘরে বাংলার সংস্কৃতি র কোন মর্যাদা নেই।

William Shakespeare
A Short Introduction to his Life and Dramatic Works

Tathagata Das
Assistant Professor in English

William Shakespeare, generally acknowledged to be the greatest playwright in the English language, was born on 23rd April, 1564 in the village of Stratford-on-Avon in the county of Warwickshire in England. He received his primary education in his village school. At the age of eighteen he married a woman named Anne Hathaway, who was eight years older than him. They had two daughters and one son, though his son died in 1596. During the early years of his life, from about 1584 onwards, Shakespeare left his native place and went to London to seek his fortune there.

Until 1582, there is no record of his activities, but about this time, he appears as an actor playing minor parts in the Company of the Lord Chamberlain's company of actors, in the Shoreditch Theatre and the Globe and Blackfriars. After 1610, Shakespeare left London for his native village and started living at New Place, the house which he had bought in 1597. He died on his birthday, April 23rd, in 1616.

Shakespeare's dramatic career may be divided into four parts. In the first period, spanning from around 1588 to 1593 when he wrote some historical plays including Richard III, a chronicle play, which is a somewhat melodramatic representation. In the second period of his dramatic career, spanning from 1594 to 1601, Shakespeare produced a number of historical plays and his great Romantic Comedies. Along with such plays as Henry IV, Parts I and II and Henry V, he wrote such sparkilng comedies, like A Midsummer Night's Dream, As You Like It, Twelfth Night, Much Ado about Nothing among other. One famous play of the time that has a tragic end and is thus different from the Romantic comedies is Romeo and Juliet.

The third period of Shakespeare's literary career which lasted from 1601 to 1609 produced his world famous tragedies such as Julius Caesar, Hamlet, King Lear, Macbeth and Othello. At this stage of his career, Shakespeare was preoccupied with the depiction of the darker side of the human mind and its various propensities and intricacies.

During the last period of his dramatic career which spans some two to three years, Shakespeare turned to the expression of a mellow and serene view of life as he must have experienced at this time. This idea finds expression in the final romance - comedies such as Cymbeline, The Winter's Tale and The Tempest, the last mentioned play being his final one.

Shakespeare's relevance for the present generation of readers and playgoers lies in his unique charm in the presentation before his audience the peculiar charm and beauty of life as well as his profound tragic view of life. His mastery in drawing the characters of men and women from all walks of life transfroms them into living figures before our eyes. He has successfully sketched them in all their myriad foibles and virtues and consequently they become realistic and lively representations.

One of the chief appeals of his plays is, of course, the poetic expression of his ideas and themes. He took up the blank verse and gave it a perferction and fluency. He was a dramatist who wrote his plays essentially as representations on the Elizabethan stage. His plays had everything for every type of audience of his time, be it the aristocratic audience of Queen Elizabeth or KIng James' court or the lowly groundlings who were interested in low comedy. Thus, for all these qualities of his dramatic works, Shakespeare has been rightly termed by his younger contemporary, Ben Jonson, as being "not for an age but for all time."

THE RISE OF ENGLISH NOVEL IN 18 CENTURY

Taniya Rahaman, Eng (Hons) 3rd year
General Secretary Students Union

During the 18th century most of the major innovations in subject matter as well as narrative techique took shape. In the beginning the art of fiction often involves the close imitation of true narratives, while it in the end ficttional narrative both competes with and contributes to the writing of historical narrative. Throughout the period, there is (in the sense of aesthetic ideology) exerting of intense pressure upon content, while the content (the social and sexual conflicts of the period, along with the growing force of nationality) exerts a counter pressure upon literary from. By the middle of the century (1740-54) three great novelists had permanently modified the art of English fiction : of these Richardson dilated the short story or "novel," as it was called before his day, by means of psychological or sentimental detail; and Fielding added structure, style, and a realistic attitude towords life. Other novelists of the 18th Century include Laurence Sterne. The neat, suspensive structure formulated by Fielding and Richardson, through its very excellence perhaps, led virtuosos like Sterne to play tricks with structure.

Richardson, born in 1689 in Mackworth Derbyshire, is considered the "father of the moderm novel". His first novel Pamela : or, Virtue Rewarded fleshes out into a complex and intriguing two-volume epistolary novel, presented as a genuine correspondence over which the anonymous Richardson acts as editor, in which the young servant's trials at the hands of her master Mr. B. are related. While countless early eighteenth - century romances had centred around a central seduction narrative, Richardson claimed a more elevated literary and moral design for Pamela. He claimed in the Preface that while the novel would "Divert and Entertain", it would also "Instruct, and Improve the Minds of the Youth of both Sexes". As the novel's subtitle suggests, by the end of the narrative virtue is rewarded as Pamela's behaviour and character win over Mr.B. and the couple marry. The impact of the publication is hard to overestimate. The reverend Dr. Slocock of St. Saviour's Southwark famously recommended the novel from his pulpit and, as Anna Barbauld relates, it became fashionable for female vistors to London's pleasure gardens to carry a copy of the novel about their person. Vauxhall Gardens boasted scenes from the novel as one of its attactions and there was even a Pamela fan, although none is known to exist to the present.

In 1744 Richardson began work on his next novel, the dark but brilliant Clarissa, which was eventually published serially over 1747 and 1748. Like Pamela, Clarissa focuses upon the trials forced on a young woman by a rakish aristocrat.

Unlike her predecessor, Clarissa's virtue is rewarded not on earth but in heaven. Having been disowned by her family for not marrying the man of their choice, suffering the indignity of being held against her will in a brothel, and emotional pain of rape at the hands of Lovelace, Clarissa dies. The heroine's tragic and noble acceptance of her fate won many devoted admirers, some of whom, having read the first volumes, begged that Clarissa's life be spared in the final chapters. After reading Clarissa, Lady Mary Wortley Montagu recounted having wept "like a milkmaid".

Pamela introduced Richardson to the literary world and with it a wide array of correspondents with whom he exchanged views on his first novel. These correspondents, who included Colley Cibber, Laetitia Pilkington, and Aaron Hill, were also involved in the composition of Clarissa, and were sent drafts of the novel upon which they commented. The publication and enthusiastic reception of Clarissa encouraged other readers to engage in epistolary dialogues with the author which curiously mirror and shape the exchanges of letters within his own novels. Amongst these valued correspondents were many women and female authors including Lady Bradshaigh, Jane Collier, Sarah Fielding, Elizabeth Carter and Hester Mulso (later Chapone).

Hester Mulso's correspondence with the author seems to have been particularly in shaping Richardson's final novel Sir Charles Grandison (1753-1754), as an epistolary model for the letter of the text's heroine Harriet Byron. Like his earlier works, Grandison is written in a series of letters, but unlike its predecessors focuses upon the virtues and duties of a good man, the benevolent yet tyrannical Sir Charles. The novel which is predominantly concerned with marriage, courtship, madness, filial and paternal duty was immediately successful.

Richardson's standing as a writer remained high throughout his lifetime and his long novels, with their great characterizations and minute details appeal to the heart. Yet Richardson's works always divided readers, and during the nineteenth century there is evidence to suggest that the critical balance tipped out of his favour. Following the publication of Ian Watt's seminal Rise of the Novel (1957), however, critics have successfully restored Richardson to the title of (at least one) founding father of the modern realist novel, centred around the private, domestic world of the bourgeois household and the private subjectivity of the bourgeois subject.

Henry Fielding turned to novel writing after a successful period as a dramatist, during which his most popular work had been in burlesque forms. An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews (1741), a travesty of Richardson's Pamela, transforms the latter's heroine into a predatory hunter who cold-bloodedly lures her booby master into matrimony. Fielding continued his quarrel with Richardson in The History of the Adventures of Joseph Andrews (1742), which also uses Pamela

as a starting point but which, developing a momentum of own, soon outgrows any narrow parodic intent. His hostility to Richardson's sexual ethic notwithstanding, Fielding was happy to build, with a calm and smiling sophistication, on the growing respect for the novel to which his antagonist had so substantially contributed. In Joseph Andrews and The History of Tom Jones, a Foundling (1749), Fielding openly brought to bear upon his chosen form a battery of devices from more traditionally reputable modes (including epic poetry, painting, and the drama). This is accompanied by a flamboyant development of authorial presence. Fielding the narrator buttonholes the reader repeatedly, airs critical and ethical questions for the reader's delectation, and urbanely discusses the artifice upon which his fiction depends. In the deeply original Tom Jones especially, this assists in developing a distinctive atmosphere of selfconfident magnanimity and candid optimism. His fiction, however, can also cope with a darker range of experience. The Life of Mr. Jonathan Wild the Great (1743), for instance, uses a mock-heroic idiom to explore a derisive parallel between the criminal underworld and England's political elite, and Amelia (1751) probes with sombre precision images of captivity and situations of taxing moral paradox.

Laurence Sterne has often been claimed as a precursor of modernist, the comic play of his writing anticipating the work of James Joyce or the formal ironies of postmodern textuality. His two novels are The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gent, which won him immediate recognition, and a Sentimental Journey through France and Italy. They are made up of Strene's peculiar blend of pathois and humour. The first volume of Tristram Shandy found immediate success on its emergence in 1760. If it was the most fashionable of works, critics and readers were uncertain what to make of it. It was a "riddle without an object", which some celebrated as a truly original work ridiculing "the vices and follies of mankind" and Sterne as a "modern Democritus"; other read the book, tongue partially in cheek, as a "compleat system of modern politics" that needed its allegorical key. In 1767 Sterne sat down to write what he called his "work of redemption", A Sentimental Journey, a narrative which captured the vogue for sentimental feeling and made it its own, animated by the mercurial ironies of his alter ego Yorick, and the touristic experience of travelling through France and Italy. It was published in the following year. It is as a sentimental writer that Sterne's legacy was valued in the following decades of the eighteenth century, despite the knowing cynicism that some critics attributed to the feeling in his work. His A Sentimental Journey, in particular, remained highly popular. The Victorians on the whole loathed his work, unable to see past the moral indecency to its "learned wit", a view that fed into F.R. Leavis's famous dismissal of its "irresponsible (any nasty) trifling"

Other novelists of the period include Tobias Smollett (The Adventure of Roderick Random, The Adventures of Peregrine Pickle, etc.), Horace Walpole (The Castle of Otranto), William Beckford, Mrs. Ann Radcliffe, Henry Burney. Tobias Smollett excelled in the invention and cusp presentation of unforgettably vivid burlesque episode. Through Richardson, Fielding and Smollett fiction acquired a sense of pattern or structure, richness of varied detail, and gravity as well as comedy. All three were critics of manners. Fielding was both an artist and a critic of his art, which he analyzed in his brilliant essays or prefaces and which he dignifed by associating it with the narrative forms, the epic. As psychologists the three vary considerably, but each has his excllences. Their purpose were avowedly moral ; they taught men to know themselves and their proper "spheres" and appropriate manners.

অদৃশ্য পাত্র রহস্য

অপরূপ চক্রবর্তী
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

একটা বড় অদ্ভুত সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আপনার শরনাপন্ন হয়েছি চঞ্চলবাবু - বললেন মানসবাবু। চঞ্চল তখন তার প্রিয় আরাম কেদারায় বসে অত্যন্ত খুঁটিয়ে সামনের সোফায় বসা ভদ্র লোককে দেখছিল - মাঝ বয়সী, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা, দাঁড়িগোঁফ কামানো ভদ্রলোকের নাম মানসগুপ্ত, চঞ্চলের ২০।১ সি হাজরা রোডের বাড়িতে কথাবার্তা চলছিল। চঞ্চল - আপনি সব কথা খুলে বলুন। মানস - আমি বউবাজারে হিদারাম ব্যানার্জী লেনে এক শরিকি বাড়িতে থাকি। এই দোতলা বাড়িটায় আমার ভাগে দোতলার দুটো আর একতলায় একটাঘর আছে। সাধারণ কাজ করে সংসার চালাই তাই কিছু দিন আগে একতলার ঘরটা একটা ছেলেকে ভাড়া দিলাম। নাম রঞ্জন মল্লিক - ছোকরা দেখতে শুনতে বেশ, কথাবার্তায় চটপটে। সে এসে থাকতে শুরু করল। এমনিতে তাকে নিয়ে ঝামেলা ছিল না। যদিও ছেলেটা কি কাজ করে তা আমরা জানতাম না। কখনো কোন লোককে তার কাছে আসতেও দেখা যায়নি। অথচ এক সন্ধ্যাবেলা তার বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে দুজন মানুষের গলার আওয়াজ শোনা গেল। এরপর প্রায় প্রত্যেক দিনই সন্ধ্যায় তার বন্ধ দরজায় কান পেতে আমরা কথাবার্তা শুনেছি। যদিও অস্পষ্ট কিন্তু বোঝা যেত যে রঞ্জন পাত্র বলে কারো সঙ্গে কথা বলছে। অথচ তারপর রঞ্জন দরজা খুললে দেখা যেত যে ঘরে সে একাই আছে কিন্তু দরজা দিয়ে কাউকে বেরোতে দেখা যায়নি। এই অবস্থায় পাড়ার মানুষরা রটনা করতে শুরু করল যে একজন লম্বামত লোক প্রায়ই জানলা দিয়ে ঐ ঘরে ঢুকে রঞ্জনের সঙ্গে বিবাদ করে। অথচ সেই মানুষকে কেউ কখনো দেখেছে কিনা সন্দেহ। বলুন তো এ কেমন ভৌতিক ব্যাপার। অথচ ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ হবে বলে আমি রঞ্জনকে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা ও করতে পারিনি। এ পর্যন্ত বলে মানসবাবু থামলে চঞ্চল বলল - এই ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? এটা ঠিক যে ব্যাপারটা একটু রহস্যময় কিন্তু কোন গোলমেলে ব্যাপার তো ঘটেনি। মানস - ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু ঘটতে কতক্ষণ। আপনি যদি নিজের চোখে ব্যাপারটা একুট দেখেন তো আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। সৌমেন আপনার অনেক সুখ্যাতি করেছে। সৌমেন অর্থাৎ হাতিবাগান থানার সাবইন সপেক্টর সৌমেন্দু শেখর মিত্র যার সঙ্গে একটা কেসের সূত্রে চঞ্চলের আলাপ। সে এই ভদ্রলোককে পাঠিয়েছে। চঞ্চল কিছু ক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করল। তারপর কেদারা থেকে উঠে বলল - চলুন আপনার বাড়িটা দেখে আসি। মানস উৎফুল্ল হয়ে - যাবেন ..... চলুন চলুন। চঞ্চল একটু দাঁড়ান, পোশাকটা পালটে আসি। মানসবাবুকে নিয়ে চঞ্চল যখন বউবাজারে পৌছালো তখন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমেছে। মানসবাবুর বাড়িটা একটা সরু গলিতে। এখানে ঢোকার সময় চঞ্চল দেখল একটা রোয়াকের উপর একদল বাচ্চা খেলা করছে - ওদের অনেকের হাতে একরকম গোলাপীরং এর কাগজ। এমন কিছু দলাপাকানো কাগজ রাস্তায় পড়েছিল যার একটা তুলে নিয়ে চঞ্চল দেখলো কাগজটায় সার্কাসের বিজ্ঞাপন ছাপানো আছে।

আগামী মাসে সিঁথির মোড়ে যে গ্রেট ইস্টার্ন সাকাস আসছে তার বিভিন্ন রোমাঞ্চকর খেলার উল্লেখ - যেমন ব্রহ্মানন্দ পাত্র নামের জাদুকরের নানা খেলার তামাসা। কাগজটা ফেলে মানস বাবুর সঙ্গে কিছু পথ গিয়ে চঞ্চল গলির বাঁকে কিছু মানুষের ভিড় দেখল। মানস একটু শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে বললেন - আমার বাড়ির সামনে এত ভিড় কেন - কি হয়েছে? তখন ভিড়ের মধ্য থেকে এক মাঝ বয়সী রোগা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন মানস কোথায় ছিলে? তোমার ভাড়াটের ঘরে কিসব ঘটে গেছে। মানস - কি হয়েছে নারায়ণ বাবু? তাঁর বলা শেষ হতে না হতেই বাড়ির সদর দরজা খুলে এক ভদ্র মহিলা বেরিয়ে পড়লেন ও চিৎকার করে বললেন - শুনেছো কি সাংঘাতিক কান্ড? মানস চঞ্চলকে বললেন - আমার স্ত্রী উর্মিলা। স্ত্রীকে বললেন কি হয়েছে? উর্মিলা - বিরাট গন্ডগোল বেঁধে গেছে। বন্ধ ঘরের মধ্যে রঞ্জনের সঙ্গে পাত্র বলে লোকটার কিসব ঝামেলা হয়েছে। কি একটা কাঁচের জিনিস ভাঙার শব্দ পেলাম। আমি তো ভয় পেয়ে নারায়নদাকে ডেকে আনলাম। উনি এসে রঞ্জনের ঘরের দরজায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করলেন। কিন্তু কেউ দরজা খুললনা। শেষে ..... মহিলার অসমাপ্ত কথাটা পুরো করে নারায়ণ বললেন - ঐ ঘরের বন্ধ জানলার খড় খড়ির ফাঁক দিয়ে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখলাম। ঘরের অল্প আলোয় দেখতে পেলাম এককোনে রঞ্জন হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। ঘরে আর কেউ নেই। পাত্র লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ব্যাপারটা গোলমেলে বুঝে থানায় খবর পাঠালাম। পুলিশ এল বলে। ইতি মধ্যে গলিতে তিনজন পুলিশ দেখা গেল। তাদের মধ্যে একজনকে দেখিয়ে নারায়ণ বললেন - ঐতো খোদ মুচিপাড়া থানার ওসি জগবন্ধু সর্দার এসেছে।

স্থূলকায় জগবন্ধু সর্দারের মাথায় মস্ত টাক গায়ের রং ময়লা। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললেন - এখানে এত ভিড় কেন? কোথায় খুন হয়েছে? এবার নারায়ণ বললেন - স্যার খুন কিনা জানিনা তবে বাড়ির একটা ঘরে কিছু একটা ঘটেছে। বলে তিনি বিস্তারিত ভাবে জানালেন। সব শুনে নিজের গোঁফে একটা মোচড় দিয়ে জগবন্ধু বললেন - চলুন ঘরের মধ্যে ঢোকা যাক। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে পুলিশ ঢুকল সঙ্গে চঞ্চল, মানস, নারায়ণ ও উর্মিলা ও ঘরের মধ্যে এক নাটকীয় ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গেল। ঘরের এক কোনে পরে আছে রঞ্জন মল্লিক - তার মুখ সবুজ রং এর রুমাল দিয়ে বাঁধা, হাত পা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। রঞ্জন অবশ্য চোখ পিটপিট করে সবাইকে দেখছিল। ঘরের মাঝখানে একটা ছোট টেবিল যার উপর দুটো কাঁচের গ্লাস, এক বান্ডিল তাস এবং একটা লম্বা ছুরি দেখা গেল। ঘরের মেঝেতে একটা গ্লাস ভাঙা অবস্থায় পরে আছে আর দেখা গেল একটা নীল রং এর রুমাল। সব কিছু দেখতে দেখতে জগবন্ধু চেঁচালেন - আপনারা কোন কিছুতে হাত দেবেন না। বলে হাতে দস্তানা পড়ে প্রত্যেকটা জিনিস তুলে দেখতে লাগলেন। চঞ্চল ও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখছিল। তার অস্তিত্ব টের পেয়ে জগবন্ধু - আপনি কে? কি চাই? এবার মানসবাবু বললেন - উনি আমার বিশেষ পরিচিত। এই বিপদের কথা শুনে এসেছেন। কথাটা শুনে জগবন্ধু নাক দিয়ে ফোঁৎ করে একটা আওয়াজ বার করলেন। তারপর কিছুটা সময় পর্যবেক্ষণ করার পর নিজের বিরাট মাথাও ভারী শরীরটাকে আন্দোলিত করে বললেন - বুঝলেন মশাই। এটা সব সহজ সরল কেস। যেসব তথ্য প্রমান পাওয়া গেছে তার থেকে স্পষ্ট যে এখানে

একটা খুনের ঘটনা ঘটেছে। শুনে উত্তেজিতভাবে মানস বললেন - কে ..... কে খুন হয়েছে? জগবন্ধু গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাঁখটা ঝাঁকিয়ে বললেন - মিঃ বি পাত্র খুন হয়েছেন আর খুন করেছে ঐ রঞ্জন ছোকরা। বলে আঙুল তুলে মেঝেতে পরে থাকা রঞ্জনকে দেখালেন। ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। এবার চঞ্চল বলল - কি করে বুঝলেন? জগবন্ধু গোঁফ পাকাতে পাকাতে বললেন - কয়েকটা সিম্পল ক্লুর সাহায্যে। আর আমার মত পুলিশ অফিসারের তা নজর এড়িয়ে যেতে পারেনি। একটু বোকাটে হাসি হেসে চঞ্চল বলল - যদি একটু ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেন। জগবন্ধু - যদিও তদন্তের ব্যাপারটা গোপন রাখাই উচিত তবু বলছি কয়েকটা প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঘরের মেঝেতে যে রুমালটা পাওয়া গেছে তাতে নীলরং এর মধ্যে এক কোনে লাল সুতো দিয়ে বোনা দুটি অক্ষর - বি.পি. - এই দেখুন। এটা মনে হয় মিঃ পাত্রের রুমাল যেটা হাতাহাতির সময় পরে গেছে। মেঝেতে রুমালটা কুড়াতে গিয়ে এক ফোঁটা রক্ত ও দেখলাম। তারপর রঞ্জনকে দেখে বুঝলাম ও অক্ষত আছে। বুঝলাম রক্তবিন্দুটা মিঃ পাত্রের। তাছাড়া রঞ্জনের দড়ির বাঁধনটা দেখে বুঝলাম ওটা ইচ্ছা করলে ও নিজেই খুলতে পারে। এবার বিকট চিৎকার করে জগবন্ধু বললেন - আসলে সবটাই রঞ্জনের খাপ্পাবাজি।

রঞ্জনই পরিকল্পনা মাফিক সব ব্যাপারটা সাজিয়েছে। জগবন্ধু বললেন - আমার মনে হয় বি পাত্র লোকটা ছিল একজন ব্ল্যাক মেলার। সে দীর্ঘদিন ধরে রঞ্জনকে ভয় দেখিয়ে শোষণ চালাচ্ছিল। শেষে রঞ্জনের ধৈর্যচ্যুতি হয়। তাই ঘরে এক মদ ও তাসের আড্ডা বসিয়ে সেখানে এনে পাত্রকে খুন করে। এখানে এমন হয়নি যে পাত্র রঞ্জনকে খুনের চেষ্টা করেছিল। সাধারণত ব্ল্যাক মেলাররা তাদের শিকারকে খুন করে না। তবে রঞ্জনের হাতে পাত্র খুন হয়। দীর্ঘ বক্তব্যের পর জগবন্ধু থামলে চঞ্চল বলল - সবই তো বুঝলাম কিন্তু লাসটা গেল কোথায়? জগবন্ধু যেন বাচ্চাদের বোঝাচ্ছে এমন ভাবে বলল - আরে রঞ্জন তো লাসটা গায়েব করে দিয়েছে। চঞ্চল চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে বলল - এবার তাহলে বাছা ধনের মুখের ঢাকনাটা খুলতে হয়।

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে চঞ্চল রঞ্জনের মুখের রুমালটা খুলে দিয়ে রুমালটা হাতে নিয়ে দেখল। তারপর বলল - আরে দুটি রুমালেই তো একরকম ভাবে বি.পি. লেখা আছে। এবার একটু চমকে গিয়ে জগবন্ধু বললেন - তা হতেই পারে। হয়তো মিঃ পাত্রের পকেটে দুটো রুমাল ছিল। চঞ্চল - সাধারণত মানুষের সঙ্গে একটাই রুমাল থাকে। হঠাৎ রঞ্জন হো হো করে হেসে উঠল। এই ঘটনায় ঘরের সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে জগবন্ধু বললেন - কি হে ছোকরা খুন করে ও তোমার কোন বিকার নেই? চঞ্চল - ও হাসবে না কেন বলুন তো? সবাইকে কেমন বোকা বানিয়েছে। এবার মানস বললেন - তার মানে? চঞ্চল মাথা নেড়ে বলল - ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আসলে পাত্র খুন-ই হয়নি কারণ পাত্র নামক মানুষটার কোন অস্তিত্বই নেই। জগবন্ধু - কি উলটা পালটা রসিকতা করছেন? চঞ্চল এবার গম্ভীর কণ্ঠে বলল - রসিকতা নয়। আসল ব্যাপারটা হল রঞ্জন মল্লিক একজন ম্যাজিশিয়ান যে ব্রহ্মানন্দ পাত্র ছদ্মনামে সার্কাসে নানারকম খেলা দেখায়। যেমন দড়ির খেলা বা হাতের খেলা তবে সবচেয়ে আকর্ষনীয় খেলা ভেন্ট্রিলোকুইজম বা স্বর ক্ষেপণ। ও ঘরের দরজা বন্ধ করে এই খেলাগুলি অনুশীলন করত।

বিশেষত ভন্ট্রিলোকুইজম অভ্যাসের সময় রঞ্জনের বন্ধ ঘর থেকে নানা কণ্ঠস্বর শুনে আপনারা সবাই বিভ্রান্ত হয়েছেন। আর গ্লাস নিয়ে জাগলিং করার সময় হাত ফসকে একটা গ্লাস পড়ে ভেঙে যাওয়ার ও উত্তেজিত হয়ে পাত্র পড়ে গেল বলে উঠেছিল। ঐ ভেঙে যাওয়া গ্লাসের একটুকরো কাঁচ ওর আঙুলের কোনে লাগায় ওখান থেকেই সামান্য রক্তপাত হয় যেটা মেঝেতে দেখা গেছে। রঞ্জনের আঙুলটা পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। এছাড়া দড়ির খেলা অভ্যাস করতে গিয়ে নিজের শরীরকে বেঁধেছিল। আর এসব করতে গিয়ে বেচারা পড়ল বিপদে .... কি বল রঞ্জন? এবার রঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে খুব সহজে নিজের শরীর থেকে সব বাঁধন খুলে ফেলল। তারপর বলল - সত্যি ভাবিনি গোপনে অনুশীলন করতে গিয়ে এমন ঝামেলায় ফেঁসে যাব। বলে তার সার্টের পকেট থেকে একটা গোলাপী কাগজ বার করল। চঞ্চল - ওটা তুমি দারোগাবাবুকে দেখাও। এতক্ষণ ধরে জগবন্ধু চুপ করে ছিলেন। এবার কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নাক থেকে একটা শব্দ করে বললেন - যতসব ফালতু ব্যাপারে কেন যে আপনারা পুলিশকে হয়রান করেন বুঝিনা? বলে সকলের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবার ঘরে উপস্থিত বাকিরা হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামলে মানসবাবু বললেন রঞ্জন তোমার এই অনুশীলনের ব্যাপারটা গোপন রাখা কি খুব দরকারী ছিল? রঞ্জন - আসলে আপনাদের সবাইকে চমকে দিতে চেয়েছিলাম। এরপর সে জাদুকরের ভঙ্গিতে সবাইকে অভিবাদন করে বলল - আগামী মাসের পাঁচ তারিখ আপনাদের গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাসে আসার আমন্ত্রণ রইল। এবার চঞ্চল বলল - কথায় বলে শেষ ভালো যার সব ভালো। আমি অবশ্যই তোমার খেলা দেখতে যাব।।

অ্যাডভেঞ্চার

প্রদীপ কর্মকার

ছোটো থেকেই গ্রাম সম্পর্কে ভয়ানক কৌতূহল ছিল। তাই স্কুলে বা রাস্তার ফেরিওয়ালা যাদেরই দেখতাম তাদেরই সঙ্গে ভাব জমিয়ে গ্রামের নানান গল্প শুনতাম। কিন্তু দুখের সাধ কী ঘোলে মেটে? পড়াশুনো শেষ করেও এত বছর চাকরি করছি কোনদিন গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। মনের কোনে একটা তীব্র বাসনা অবদমিত ছিল। আজ আমার স্বপ্নটা এমন ভাবে পূরণ হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

গ্রামের মাষ্টার মশাই এর বাড়ির ছাদে ঘুরছি। এত ভালো লাগছে যার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও মনের কোনে এক ভয়ানক দুঃশ্চিন্তা উঁকি দিচ্ছে এই কথা ভেবে যে কাল সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হবে তাই কাজ সেরে গ্রাম পরিদর্শনের সময় কি পাবো? একদিন বেশি ও থাকার উপায় নেই, ম্যানেজারের কড়া নির্দেশ অফিসের কাজ সমস্তটা সেরে পরশু মানে মঙ্গলবার অফিসে হাজিরা দিতে না পারলে প্রমোশান তো দূরের কথা চাকরি নিয়ে টানা টানি হতে পারে। অন্যদিকে কাজও কিছু কম নয় সন্ধ্যাতো হবেই।

কোনো নেটওয়ার্ক কানেকশন ছিল না বলেই এই রাত দুপুরে বাধ্য হয়ে ছাদে উঠতে হল ভাগ্যিস টর্চটা ছিল, একটা কালোবিড়াল সিঁড়ির একেবারে মাঝখানে শুয়েছিল। আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দৌড়ে পালাল। সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠেদেখি আরেক কান্ড, ছোট বড়ো মাঝারি ইঁদুরেরা সমস্ত ছাদ ঘুরে নৈত্যসঙ্গীত গাইছিল আমি তাদের রস ভঙ্গ ঘটালাম।

চাঁদনী রাত, জোৎস্নাতে গাঁয়ের মেঠো পথ রপোলী নদীর মতো বাঁক নিতে নিতে অদৃশ্য হয়েছে। দূরের গাছেরা যেন পাহাড়, তারা একে অন্যের সাথে মিশে হিমালয় এর মতো গ্রামটাকে ঘিরে আছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার গান আর প্যাঁচার টিপ্পনী পরিবেশকে করেছে আরও রোমাঞ্চকর।

কিছুক্ষণ কথা বলেই ফোনের চার্জশেষ হয়ে গেল। ফোনের তড়িৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও মাথায় অ্যাডভেঞ্চরের তড়িৎ সঞ্চরিত হল। আর তারই টানে একটা টর্চ ও লাঠি নিয়ে কাউকে কিছু না বলে চললাম অ্যাডভেঞ্চরের উদ্দেশ্যে।

ঝিঁ ঝিঁ পোকার নেপথ্য সঙ্গীত, নাম না জানা ফুলের সৌরভ আর চাঁদের আলোর সাহচর্যে আড়ম্বর পূর্ণ ভাবেই আমার অ্যাডভেঞ্চরের শুরু। ইচ্ছা ছিল ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ফেরা।

দূর থেকে কলাগাছকে অশরীরী প্রেতাত্মা ভাবার থিওটির আজ প্রত্যক্ষ করলাম। যেহেতু ভূতে বিশ্বাসী নই সে হেতু ভয় শব্দটি আমাকে গিলতে পারছে না। টর্চের আলোর প্রয়োজন তেমন নেই জ্যোৎস্নার আলো স্পষ্ট হওয়ার সব কিছুই মোটামুটি দেখাযাচ্ছে। লাঠিটা থাকায় একদল কুকুর আর ধারে আসতে সাহস পেলনা। তারা দূর থেকেই পঞ্চম সুরে সংকেত দিতে লাগলো।

হাঁটতে হাঁটতে ঠিক কতদূর এগিয়ে ছিলাম তা বলা সম্ভব নয় তবে সামনে একটা মাঠে এক অদ্ভুত জিনিস দেখে থামতেই হল। জিনিসটা একটা যন্ত্র আমাদের মহাকাশযান গুলো যেমন লম্বা আর সরু হয় এটা দেখতে ঠিক তেমন হলেও অনেকটা ছোট। ঠিক যেমন দেবদারু গাছগুলো হয় তেমনই দেখতে, তুলনায় মাথার দিকটা সুঁচালো আর গোড়ার দিকটা মোটা।

হঠাৎ একটা আলো যন্ত্রটার একপাশে জ্বলে কিছুক্ষণ থেকে আবার দপ্ কারে নিভে গেল। আলোটা রহস্যময়ী করে তুলেছিল। একবার কয়েকটা লোক, প্রাণী বললেও চলে। মানুষের মতোই. দেখতে কিন্তু মানুষের যে বৈশিষ্ট্য তা ঠিক স্পষ্ট নয়, তারা যন্ত্রটার থেকে বিরিয়ে এল তারপর আবার তাতে ঢুকে পড়ল। ব্যাপারটা দেখে দৃঢ় ধারনা হল এটা একটা ভিন গ্রহের যান আর তারা ভিনগ্রহবাসী। আমি নিজেকে গর্বিত মনে করলাম, অন্য কেউ নয় আমিই প্রথম পৃথিবীর বুকে অন্য গ্রহের জীবকে দেখছি, আমিই সেই ব্যক্তি যে এই বিশ্বকে জানাবে তাদের কথা।

মাত্র একবার দেখাদিয়েই কি তারা গা ঢাকা দিল সেই থেকে তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। আমার মন বলছে আবার তাদের দেখা পাবো আর একবার একটু বেশী কেরই পাবো। ঠিক করলাম আর কিছুক্ষণ দেখে একুট এগিয়ে যাব।

কাছেই একটা মোটা গাছ। হেলানদিয়ে একদৃষ্টিতে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম কোনো আলো আর দেখা যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে কিছু ধাতব শব্দ শোনা যাচ্ছে। একবারতো ছেনি হাতুড়ির মতো ও শব্দ শুনলাম অন্য গ্রহেও কী এসব আছে নাকি, বুঝলাম তাদের যন্ত্রটিতে কোন গোলমাল ঘটেছে। আর তা সারাতেই তারা ব্যস্ত বলে আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি না।

মানুষের মতোই হাত পা ওয়ালা কিন্তু বিশাল বিশাল দাঁত সাদা চকের মতো মুখ থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। প্রাণীটার উচ্চতা তিন চার ফুটের বেশি নয় সামনের দিকে ঝুঁকে দৌড়াচ্ছে, আরে এযে দৌড়াতে দৌড়াতে আমার দিকেই আসছে। আর মাত্র দশ হাত দূরে আছে আমি শক্তি হারিয়েছি নিজেকে রক্ষা করার শক্তি ও নেই উঠে পালাতেও পারছি না। দেখতে দেখতে আমার উপর ঝাঁপিয়ে ...।

চোখ খুলে দেখি ভোরের আলো ফুটেছে। বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সামনে যন্ত্রটা এখনো পূর্বাবস্থাতেই আছে, তবে কী তারা যান্ত্রিক গোলযোগ এখনো সারাতে পারলো না।

এক পা দু পা করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। যত এগোচ্ছি ব্যাপারটা ততই আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে। সারারাত যাকে মহাকাশযান ভেবেছি সেটা আসলে আর কিছুই নয়, তা এক খড়ের বেশ বড়ো আকারের গাদা। কাটা হয়ে গেলে গাছ থেকে ধান নেওয়ার পর সেই গাছগুলি দিয়েই তৈরী হয় এই গাদা। আসলে সেই ঘড় গবাদি পশুর খাদ্য। তবে যে আলোটা দেখেছিলাম তা যত সম্ভব পাশের ওই জলাশয় থেকে ওঠা আলেয়ার আলো। এখন শুধু শব্দের উৎস খুঁজলেই হল। খড়ের গাদার পিছন দিকটাতে যেতে সবই বুঝলাম। সেখানে বড়ো বড়ো কাঠের টিনের বাক্স, জামাকাপড়, একটা ফাটা বালিশ, আর একটা দশটাকার নোট পড়ে আছে। না ফাটা বালিশ নয় তাকে ফাটানো হয়েছে বোধ হয় তার ভিতরে টাকা ছিল বাক্সগুলির ভাঙার কারণ ও তাই। অর্থাৎ কয়েকটা চোর কাল সারারাত আমার চোখেরই সামনে তাদের কাজ সেরে এখন দিব্যি নিজের নিজের বাড়িতে সুখ নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে।

টর্চটা পকেটে লুকিয়ে যেন মর্নিংওয়াক করছি এমন ভান করে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বট তলার এক ভিখিরীকে দশ টাকাটা দেওয়ায় সে অনেক আশির্বাদ করলো।

কবিতার কথা

জীবনানন্দ দাশ

সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি - কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকিরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তরাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

বলতে পারা যায় কি এই সম্যক কল্পনা-আভা কোথা থেকে আসে? কেউ কেউ বলেন, আসে পরমেশ্বরের কাছ থেকে। সে কথা যদি স্বীকার করি তাহলে একটি সুন্দর জটিল পাককে যেন হীরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেললাম। হয়তো সেই হীরের ছুরি পরীদেশের, কিংবা হয়তো সৃষ্টির রক্ত চলাচলের মতোই সত্য জিনিস। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের এবং কাব্য সমালোচনা-নমুনার নতুন নতুন আবর্তনে বিশ্লেষকেরা এই আশ্চর্য গিঁটকে - আমি যত দূর ধারণা করতে পারছি - মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খসাতে চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগত ভাবে এ সম্বন্ধে আমি কি বিশ্বাস করি - কিংবা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করবার মতো কোনো সুস্থিরতা খুঁজে পেয়েছি কি না - এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলব না আমি [illegible]র। কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে - পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যে[illegible]র ভিতর চমৎকার রূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা রচনা করতে হবে তাঁদের এ দাবির সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে ত[illegible]ব করতে হয়েছে যে, খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়, - একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজ-শিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানা রকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সব চেয়ে আগে এবং সব চেয়ে বেশি করে; কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।

আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যাখচিত-অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধ্য নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারনা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে চায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না - পদ্য লিখিত হয় মাত্র - ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্য রকম,

কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে - কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ; কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে; কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে; বুঝতে পারে যে তারা সংগতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না, কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়; জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মৃষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মতো স্নান না করে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের শাদা রৌদ্রের মতো, - সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।

এ না হলে আমরা জিজ্ঞাসা ও চিন্তার জন্যে কেন পতঞ্জলির কাছে যাব না, বেদান্তের কাছে যাব না, ষড়দর্শনের কাছে যাব না, মাঘ ও ভারবির কাছে না গিয়ে? জীবনের ও সমাজের ও জাতির সমস্যার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোক চাই - অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে যাব না কেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কাছে না গিয়ে; দার্শনিক বার্গসঁ'র কাছে যাওয়া উচিত, ইংলন্ডের বা রুশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিদ সুধী কর্মীদের কাছে যাওয়া উচিত - ইয়েটসের কাব্যের কাছে, এমন কি এলিয়ট ইত্যাদির কাব্যপ্রচেষ্টার কাছেও নয়।

এখন আমি আর একটা কথা বলতে চাই খানিকটা অত্যুক্তি করেই যেন, অথচ যা অত্যুক্তি নয় - আমার কাছে অন্তত সত্য বলে মনে হয়; কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি অর্ধনারীশ্বরের মতো একাত্ম হয়ে থাকে না; ঘাস, ফুল বা মানবীর প্রকট সৌন্দর্যের মতো নয়; তাদের সৌন্দর্যকে সার্থক করে কিন্তু তবুও সেই সৌন্দর্যের ভিতর গোপন ভাবে বিধৃত রেখা উপরেখার মতো যে জিনিসগুলো মানবী বা ঘাসের সৌন্দর্যের আভার মতো রসগ্রাহীকে প্রথমে ও প্রধান ভাবে মুগ্ধ করে না - কিন্তু পরে বিবেচিত হয় - অবসরে তার বিচারকে তৃপ্ত করে। যাঁরা এ কথা স্বীকার করেন না, যাঁরা বলতে চান যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস কিংবা সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সৌন্দর্যের মতোই প্রধান জিনিস, হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানা রকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন তাঁদের আমি এই কথা বলতে চাই যে মানুষ - সে যে অনৈতিহাসিক শতাব্দীতেই প্রথম হোক না কেন - একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা দর্শন বা ধর্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়, - যাকে বলা হল কাব্য (বা শিল্প) - যার কতগুলো ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন কি ধর্মের আস্বাদেও যা পাই না - এবং ধর্ম বা দর্শনের ভিতরে যে তৃপ্তি পাই কাব্যের ভিতর অবিকল তা পাই না; পৃথিবীর শতাব্দী-স্রোতের ভিতর মানুষ যদি এমন একটা বিশেষ রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল (কিংবা হয়তো অমানব কেউ মানুষের জন্যে সৃষ্টি করল) - কি করে সেই বিচিত্রতার নিকট তার অনধিগত, অতিরিক্ত-দাবি আমরা করতে পারি? কিংবা সেই সব দাবি কবিতা যদি মেটাচ্ছে বা মেটাতে পারে বলে মনে করি তাহলে তার ন্যায্য ধর্ম অভঙ্গুর নয় আর; তার বিশেষ স্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই। সে যা দিতে পারে দর্শনও তা দিতে পারে, ধর্মও তা দিতে পারে; সমাজসংস্কারক জাতিসংস্কারক মনীষীরা এমন কি কর্মীরাও দিতে পারে। তাহলে কাব্যের স্বকীয় সিদ্ধির কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমি জানি কাব্যের নিজের ইন্‌টিগ্রিটির প্রয়োজন রয়েছে। এবং

এই প্রবন্ধের ভিতর আমার নিজের কথারই পুনরুক্তি করে আমি বলব: 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; - কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকিরণ তাদের সাহায্যে করছে।' দর্শন বা সমাজসংস্কার বা মানুষের কর্ম মননের জগতে অন্য কোনো বিকাশের ভিতর এই কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ঠিক এই ধরনের সারবত্তা নেই।

হতে পারে কবিতা জীবনের নানা রকম সমস্যার উদ্‌ঘটান; কিন্তু উদ্‌ঘাটন দার্শনিকের মতো নয়; যা উদ্‌ঘাটিক হল তা যে কোনো জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে; যদি তা না দেয় তাহলে উদ্‌ঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোনো চিন্তার নতুন আবৃতি, কিংবা হয়তো নতুন কোনো চিন্তাও (যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে,) কিন্তু তবুও তা কবিতা হল না, হল কেবলমাত্র মনোবীজরাশি। কিন্তু সেই উদ্‌ঘটান - পুরোনোর ভিতরে সেই নতুন কিংবা সেই সজীব নতুন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে, তাহলে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল; আরো নানা রকম মূল্য - যে সবের কথা আগে আমি বলেছি - তার থাকতে পারে, আমার জীবনের ভিতর তা আরো খানিকটা জ্ঞান বীজের মতো ছড়াতে পারে, আমার অনুভূতির পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে, আমার দৃষ্টি-স্থূলতাকে উঁচু মঠের মতো যেন একটা মৌন সূক্ষ্মশীর্ষ আমোদের আস্বাদ দিতে পারে; এবং কল্পনার আভায় আলোকিত হয়ে ও সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীর ভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন প্রদীপ - ততই নক্ষত্রের নতুনতম কক্ষ-পরিবর্তনের স্বীকৃতি-ও-আবেগের মতো জ্বলতে থাকবে।

প্রত্যেক মনীষীরই একটি বিশেষ প্রতিভা থাকে - নিজের রাজ্যেই সে সিদ্ধ। কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে; কাব্যসৃষ্টির ভিতরে। আমরা হয়তো মনে করতে পারি যে যেহেতু সে মনীষী কাজেই অর্থনীতি সম্বন্ধে - সমাজনীতি, রাজনীতি সম্বন্ধে, মননরাজ্যের নানা বিভাগেই, কবির চিন্তার ধারা সিদ্ধ। আমাদের উপলব্ধি করে নিতে হবে যে তা নয়। উপকবির চিন্তার ধারা অবশ্য সব বিভাগেই সিদ্ধ - যেমন উপ-দার্শনিকের। কিন্তু প্রতিভা যাকে কবি বানিয়েছে কিংবা সঙ্গীত-বা-চিত্রশিল্পী বানিয়েছে - বুদ্ধির সমীচীনতা নয়, - শিল্পের দেশেই সে সিদ্ধ শুধু - অন্য কোথাও নয়। একজন প্রতিভাযুক্ত মানুষের কাছ থেকে আমরা যদি তার শ্রেষ্ঠ দান চাই, কোনো দ্বিতীয় স্তরের দান নয়, তাহলে তা পেতে পারি সেই রাজ্যের পরিধি ভিতরেই শুধু যেখানে তার প্রতিভার প্রণালী ও বিকাশে তর্কাতীত। শেক্সপীয়রের কথাই ধরা যাক - তাঁর এক-একটি নাটক পড়তে পড়তে বোঝা যায়, মনোবৈজ্ঞানিকের কাছে যেমন করে পাই তেমন করে নয়, মানবচরিত্রে ও মানুষের প্রদেশ সম্বন্ধে নানা রকম অর্থ ও প্রভূত সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল কাব্যের সমুদ্রবীজনের গভীরে গভীরে মুক্তোর মতো, কিংবা কাব্যের আকাশের ওপারে আকাশে স্বাদিত, অনাস্বাদিক নক্ষত্রের মতো সব খুঁজে পাওয়া গেল যেন। কারণ এখন আমরা প্রতিভার সঙ্গে বিহার করছি সেই রাজ্যে যেটি তাঁর নিজস্ব। কিন্তু শেক্সপীয়রকে যদি ইংলন্ডের কোনো জনসভায় দাঁড়িয়ে প্রবন্ধ পাঠ করতে হত

এলিজাবেথীয় সমাজ সম্বন্ধে, আমি ধারণা করতে পারি না যে অন্য কোনো অভিজ্ঞ সমাজনীতিবিদের চেয়ে তা কোনো অংশে অসাধারণ কিছু হত (হয়তো হাসি তামাশা এবং যুক্তিহীন মুখর প্রশংসা থাকত সেই সমাজ ও সমাজপতিদের সম্বন্ধে)। কিংবা শেক্সপীয়রকে যদি ইংলন্ডের কোনো বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে ইংলন্ডের তখনকার রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হত, সে অভিভাষণের ভিতর কোনো বাগ্মিতা থাকত বলে মনে হয় না - তা নাই বা থাকল - কিন্তু তেমন কোনো সারবত্তাও থাকত না ইংলন্ডের তখনকার রাজনীতিজ্ঞদের আলোচনায়ও যেটুকু রয়েছে; কিংবা তার ঈষৎ প্রতিবিম্বও থাকত না শেক্সপীয়রের নিজের কাব্যে অন্যরকম সারবত্তার যে আশ্চর্য ব্যাপক গভীরতা আমাদের বিস্মিত করে। বৈষ্ণব যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমাদের কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শেক্সপীয়রের সম্বন্ধে যে কথা বললাম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা চলে - সব কবির সম্বন্ধেই। অন্য সমস্ত প্রতিভার মতো কবি-প্রতিভার কাছেও শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হলে যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাকে খুঁজতে হবে; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই, ধর্ম ও নেই - কিংবা এই সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত নয় আর; এ সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ও ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও মনীষী ও কর্মীদের হাতে যেন - কবির হাতে আর নয়।

কেউ যেন মনে না করেন আমি কবিকে কাব্যসৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে নিষেধ করছি না। কবি তার ব্যবহারিক জীবনে কর্ম-ও-মননরাজ্যে যেখানে যে অসঙ্গতি বা অন্ধকার রয়েছে বলে মনে করেন সব কিছুর সঙ্গেই সংগ্রাম করতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত; এই প্রবন্ধের আরম্ভেই আমি বলেছি যে তার কাব্যেও কল্পনা-ভিতর চিন্তা-ও-অভিজ্ঞতার সারবত্তা থাকবে। আমি তার প্রতিভার স্বধর্মের কথা বলেছি; কাব্য সম্পর্কে যে জিনিসের বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে আমি করেছি; এবং ব্যবহারিক জীবনে যে স্বধর্ম অসাধারণ কিছু দিতে পারি না এমন কি কাব্যজীবনকে নষ্ট করেও দিতে পারে না বলে উল্লেখ করেছি। সে যদি বাস্তবিক কবি হয় তাহলে তার কাব্যের মতো অসাধারণ কোনো দ্বিতীয় জিনিস ব্যবহারিক জীবনের পদ্ধতি ও প্রকাশের নিকট দান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিমান লোকের মতো কর্ম ও চিন্তা দান করতে পারে সে, - ব্যবহারিক মানুষ হিসেবে। সেখানে তার কাব্যজগতে কল্পনামনীষার মুক্তি নেই - এবং তার প্রয়োজনও নেই।

স্বপ্ন দেখো

নিরুপম আচার্য
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আকাশ ভারি মায়া ছড়ায়
মেঘেরা দেয় স্বপ্ন ছুঁড়ে,
বাতাস করে কানাকানি
মাতাল করা উদাস সুরে।

তোমরা যে সব কোথায় গেলে
বন্ধ করে হৃদয় দুয়ার?
পারবে না তো থাকতে ঘরে
মুদবে আঁখি কেমন করে?
তোমরা সে সব কোথায় গেলে
বন্ধ করে হৃদয় দুয়ার?

অন্ধকারের ভেতর থেকে আলোকরেখা ছিটকে পড়ে
সেই আলোতে পথ চিনে যে চলতে হবে নিজের পথে।
তোমরা সবাই বেরিয়ে এসো
আগল ভাঙো, স্বপ্ন দেখো।

সত্য - ঝড়

রুমনা সরকার
অধ্যাপিকা ইতিহাস বিভাগ

সাহস থাকুক সত্যি টুকু বলার
কীলাভ হবে সত্য গোপন করে?
মনের মধ্যে উথাল পাথাল ঝড়
তার ধাক্কায় ভাঙলো বুঝি ঘর।

জীবন জুড়ে শুধুই অভিনয়
মন পুড়েছে, ঘর ও পুড়ক
ভালো থাকার নেই যে অভিপ্রায়
জীবন এখন সত্যি বড়ো দায়।

একটি জিজ্ঞাসা

লালমিয়া মোল্লা
কোষাধ্যক্ষ, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

চারিদিকে এতো আলো নাকি স্বচ্ছ-অন্ধকার
ছদ্মবেশে এতো পথ সীমান্তহীন নাকি মরীচিকা
এতো কাঁটা যাব কোন পথে বাড়ানো রয়েছে
এতো হাত নাকি মায়া হাতছানি এতো দ্বার
খোলা নাকি হানা-বাড়ি এতো ফুল এতো উদ্যান
সে কি বসন্ত নাকি ভয়াল অরণ্য মৃদুমন্দ
এ বাতাস নাকি ঝড়ের পূর্বাভাস পারিজাত
পুষ্পের এতো ঘ্রাণ নাকি মারণ শ্বসন
এই খাল নদী ঝিল জলাশয় সে কি অমৃতকুম্ভ
নাকি গরল-তরল .....

হে বুদ্ধ মার্গ কোন দিক? শান্তি ও সাম্যের দীক্ষা
কোথায় হজরত এই যুদ্ধদীর্ণ পৃথিবীতে
কোথায় বর্ষিত হয় কৃষ্ণের বাণী?
ক্ষমা কই হে মেরীপুত্র যিশু?

হলুদ বইয়ের পাতা আলো দেয়
বিদ্যা-পুঁথি মলাট বিহীন -

ধর্মের ধারাপাত কেন এতো পিছে উড্ডীন?

অবসাদ

মহিবার রহমান
কম্পিউটার পারসোনেল, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

জীবন নদীর অদম্য খরস্রোত শান্ত অকস্মাৎ।
নীরবতা - ভীতির শিহরণে রিক্ত,
বক্ষ বিদীর্ন - হৃদয় চূর্ন - আঁখিদ্বয় সিক্ত,
আপনার শ্বাস আপন কর্ণ - কুহরে করে পদাঘাত।।

অসীম প্রত্যাশায় চরম প্রাপ্তির অধীরতার ক্ষণে ;
কল্পনাতীত - স্বপ্নাতীত বজ্রসম প্রতিদান,
তীক্ষ্ণতর খঞ্জরাঘাতে কোমল হিয়া খান-খান,
তব টাল - মাটালে জীবন সুধা ব্যর্থ অনুরণে।।

গাঢ়-তিমিরে আচ্ছাদিত অন্তঃকরণ ; বাহির মরু-সাহারা।
মৎস্য-পিত্ত সম তিক্ত জীবন - নিঃশ্বাস,
কন্টকিত জীবনের কী নির্মম পরিহাস।
বেছে নিতে চায় এ প্রাণ জাপানের "অওকি গাহারা"।।

তোমার নাম

মহঃ আসিফ ইকবাল
দ্বিতীয় বর্ষ, রোল - ১২৩৮

তোমার নামে বৃষ্টি ঝরে
তোমার নামে সন্ধ্যা নামে
তোমার নামে শীতের সকাল
তোমার নামে শিউলি ঝরায়,
তোমার নামে সোনালী স্বপ্ন
দেখতে দেখতে প্রভাত হয়।
তোমার নামে ভোরের আহ্বান
মধুর হয়, তোমার নামে।

জীবনের সারকথা

মহঃ আরাবুল আলি মোল্যা
বি.এ (জি), মনিং , (প্রথম বর্ষ) রোল - ১৩

মানুষের তরে মানুষের ভালোবাসা
সর্বাপেক্ষা এটাই বেশি দামী।
সবসময় বলতে পারি
এই কথাটি আমি।
সব থেকে ভেজো জিনিস
মানুষের মুখের কথা।
উপদেশ দিচ্ছি না আমি
মনে রেখো সেটা।
দুই দিনের জন্য মানুষ
পৃথিবীতে এসেছে।
আসল জিনিস ফেলে মানুষ
নকলের দিকে ছুটেছে।
লোভ, হিংসা, ভেদাভেদ
মানুষের মধ্যে রয়েছে।
মহান ব্যক্তি এই সব কথা
স্বর্ণাক্ষরে লিখেছে।

আমি হারিয়ে যাবো

শেখ হাবিবুল্লা
বি.এস.সি (জি) রোল - ০৬

হারিয়ে যাবো একদিন আমি
রবনা এ ভূবনে চিরদিন।
ক্ষমা করে দিও তোমরা আমায়
ভুল করে থাকি যদি কোনদিন।
হারিয়ে যাবো একদিন আমি
রবনা এ ভূবনে চিরদিন।
বাঁশ বাগানে বা গোরস্থানে
হয়তো মোরে দেবে কবর।।
তোমরা আমায় যাবে ভুলে
রাখবে না জানি কোন খবর।
ফেলবে কি অশ্রু কোনদিন?
হারিয়ে যাবো একদিন আমি
রবনা এ ভূবনে চিরদিন।
ছোট্ট মাটির ঘরে আমার দেহ
নিথর হয়ে পড়ে রবে।
আধার এ কবরে আলোর প্রদীপ
কেহ নাহি কভু জ্বালাবে।।
থাকবে না কেউ জানি আমার পাশে।
কাটাবো একাকি রাত্রি দিন
হারিয়ে যাবো একদিন আমি
রবনা এ ভূবনে চিরদিন
ক্ষমা করে দিও তোমরা আমায়
ভুল করে থাকি যদি কোনদিন।।

ভালোবাসা

নাসিম ইকবাল
বি.এ (প্রথম বর্ষ) (সাধারন)
রোল - ২১৬

কাঁদছো কেন গভীর রাতে
একা ঘরের কোনে?
মনকে করো প্রশ্ন তোমার
ভালোবেসেছিলে?
ভালোবাসলে পাবে না কিছু
দুঃখ হবে সঙ্গী।
এখন থেকে সুখরে যাও
করো না প্রেমের ফন্দি
ভালোবাসা মহা পাপ
সবার জন্য নয়।
ভাবছো যাকে করবে সাদি
বসাবে মনের আসনে
বসবে বুকে মারবে ছুরি
যাবে না তোলা কভু তাকে
হাকার ব্যাথা বুকে নিয়ে
সমাজ মেনে নেওয়া
এরই নাম ভালোবাসা
বৃথা আশা করা।

সিরিয়াল

ফিরোজ আলি মোল্যা
বি.এ (প্রথমবর্ষ) রোল - ৪৫৬
সহঃ সম্পাদক ক্রীড়া

স্টার জলসা, জি বাংলা
ধ্বংস করল সোনার বাংলা
বোঝেনা সে বোঝেনা
ভালো - মন্দ খোঁজে না
আবার আছে জলনুপুর
ঝগড়া করে রাত দুপুর
আরো আছে বধূ বরণ
দেখতে দেখতে হবে মরণ
সাথে আছে চোখের তারা তুই
মহিলারা বলে কাজ কান ফালাইয়া থুই
যোগ হলো তুমি আসরে বলে
মেয়ে বলে নাটক ছাড়া কি জিবন চলে
এসেছে এবার কিরণ মালা
এ তো দেখি আরো জ্বালা।

শৈশবের দিন

আরাবুল ইসলাম
বি.এ (প্রথম বর্ষ), দর্শন (অনার্স), রোল - ২৮১

কোনো সময় একা স্কুলে যেতে ভয় পেতাম
আজ একা একা জগৎ ঘুরে বেড়াই।
কখন ও ক্লাসে প্রথম হওয়ার জন্য পড়তাম,
এখন অর্থের পিছনে ছুটে বেড়াই।
আগে একটু আঘাতে কেঁদে ফেলতাম,
আজ ভাঙা হৃদয় নিয়ে ও হাসি।
আগে বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার শপথ নিতাম,
আজ জীবন যুদ্ধে বন্ধুর কথা মনে নেই।
আগে একটুতে ঝগড়া, একটুতেই মিলন হত,
আর আজ অল্প কথাতেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়।
সত্যিই জীবন অনেক কিছু শিখিয়ে দিল .....
বোঝার আগেই জীবন কত বড় করে দিল।
বড় হওয়ার স্বপ্ন শৈশব কাটিয়ে দিলাম,
আজ একটাই দুঃখ, কেন শৈশবকে হারালাম????

রাত ভোর বৃষ্টি

জাহাঙ্গীর মোল্যা
বি.এস.সি (প্রথম বর্ষ) রোল - ১৮

অঝোর ধারায় বৃষ্টি ছিল কাল সারা রাত
অঝোর আকাশ ভেঙ্গে মনের ঘরে নামল জল প্রপাত
ঝড়ের তোড়ে হাট হয়েছে জানালা দুয়ার
বানভাসি আর মনভাসি সব এক একাকার।
জল নেমেছে ঢল নেমেছে হৃদয় জুড়ে
হারিয়ে গেছি মেঘের দেশে অনেক দূরে
কোথায় যেন এমন করে মেঘলা রাতে
স্বপ্ন গুলো ঢেউয়ের সাথে খেলায় মাতে
ভিজিয়েছিল বর্ষা তাদের কবে কখন
মেঘপরি তুই আগলে রাখিস তথ্য পোপন।।'

কৃষকের দুঃখ

আসরাফুল খান
বি.এ (দ্বিতীয় বর্ষ) বিভাগ - ইংরাজী
রোল - ২৫

অন্ন চাই, অন্ন চাই
অন্ন মোদের জীবন বাঁচায়
অন্নর জন্য ছুটছি,
মনুষ্যজাতি আমরা সবাই।
অন্ন যারা জোগান দেয়
তারা দেশের কৃষক ভাই।
সর্বত্র ছোটে তারা
নেই শ্রমের কোনো প্রতিদান
ঋনের দায়ে বেচতে হয় নিজেদের সম্মান।

হিংসার তরণী

মিকাইল মোল্যা

(আরিফ আমান)

বি.এ (প্রথম বর্ষ), ইংরাজী (অনার্স)

মনুষত্ব পরিচয়ে যেথা শুধুই হিংসার বাস
পূন্যের বাঁধা পয়সার সেথা হয় পাপের চাষ,
সেথায় কী সুখ আসবে ফিরে কভূ এ কালে
মিথ্যে দিয়ে ঘেরা বিশ্ব স্বার্থের পদমূলে।
কাটছে সময় পাপের মাঠে করে শুরু কাজ
পাপের মোহে পড়ে বুঝিনি কখন এল সাঁজ।
কর্তব্য ভুলে হয়েছি আমরা সর্বহারা নির্বোধ,
অভাবের জন্য স্বভাব চোল অসাম্যের ক্রোধ।
শরীরের রক্ত স্রোত শুরু হিংসার তরনী রায়
সততার স্রোতে ভাঁটা দিয়ে কান্ডারী বেয়ে যায়।
বৈচিত্র্য সর্বক্ষনে ঐক্য কিছু নাই,
শত্রুতার প্রলয় শিখা জ্বলছে সদাই।

স্রোতস্বিনী

সামসুন নাহার পারভীন

বি.এ (এইচ) প্রথম বর্ষ

আছে কি সেই স্রোতস্বিনীর অস্তিত্ব?
যার প্রবাহ শুষে নেবে আমার সকল অনুভূতি।
চরম কষ্টানুভূতি শূন্যতায় পরিণত করে,
সে নদী পরম বন্ধু হয়ে
নেবে তার বুকে টানি।
সেই সু-বিশাল প্রবাহ বাঁশি আজও খুঁজি হৃদে ;
যার বাহিত ধারা ধুয়ে দেবে মনের সমগ্র মলিনতা।
আজও আমার ব্যাকুল অন্বেষণ খোঁজে সেই শুভ তার ধারা
যার পরম পরশে জীবন হবে পরশমনি।

UNEMPLOYMENT

Mohibar Rahaman

Computer Personnel, Bhangar Mahavidyalaya

Slowing down the indomitable pace of life
The blackness question - "Who are you ?" piercing like a painful knife.
They have no identity ; they are the "Unemployed youth,"
It knife made by sharp ice of painful truth.
They have skill
While the pocket is completely 'nil'.
They have spent half - life in search of a job;
The remaining half is plunged int deep fog.
But the birds sing the same song;
The rich people sleep in peace.
No one realizes the biting deep pain ;
Who are they looking for a job down the lane ?
They have become accustomed to bear reproach assault themselves ;
Efforts to be dishonest have failed.
They're still waiting with pain ;
They are alive only in name.

SAFETY

Saifuddin Molla

B.A. (G), Roll - 395

Safety is self - awareness
We just can not be careless
Safety is self - Defense
We just should not be depressed
Safety is gainful
Accident is painful
Self - awareness is essential.
To protect ourselves
From harms and dangers
For that, we should be never negative
Which ends up to our attackers' benefit
Sometimes is better to be aggresive
That is why we say safety is the best policy.

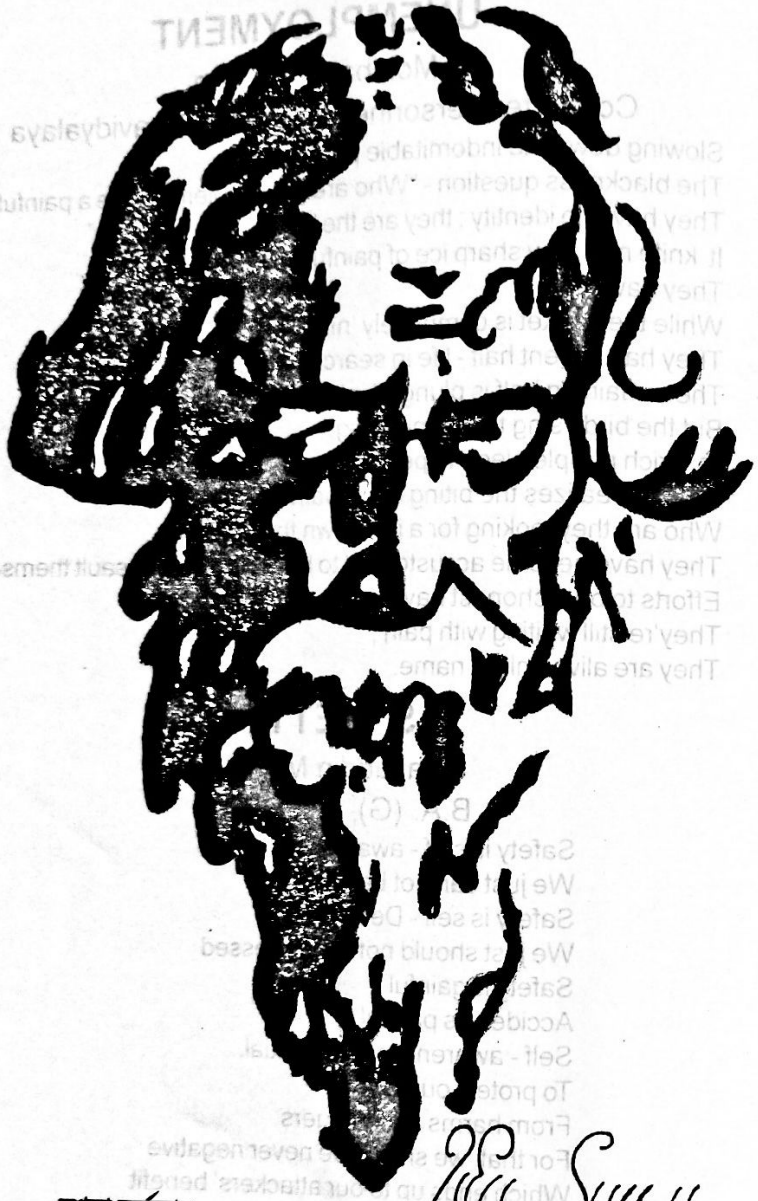

শ্রেয়া কর্মকার
বি.এ প্রথম বর্ষ (অনার্স) বাংলা রোল - ২৯৬

DISTRICT LEVEL
YOUTH PARLIAMENT
OMPETITION

ANGAR MAHAVIDYALAYA